KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৮ বি, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর. কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher দিলীপ কুমার সান্যাল
Title সমসাময়িক	Size 6" x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number 1/1 1/2	Year of Publication আষাঢ়, ১৩৪৭ আশ্বিন, ১৩৪৭
	Condition : Brittle : Good ✓
Editor : ধীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী,	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমসাময়িক

প্রথম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত • শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল পরিচালিত
কলিকাতা, ৬ বি, বকুলবাগান রো (ভবানীপুর)

বিজ্ঞপ্তি

লেখক ও পাঠকগণ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে সম্পাদক বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন। সব রচনাই দৈর্ঘ্যে এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মত ও কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া আবশ্যক। রচনাদি যথাসম্ভব সযত্নে রক্ষিত হইলেও সম্পাদক ও কর্ম্মাধ্যক্ষের পক্ষে এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট না পাঠাইলে রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব হইবে না। রচনা ও রচনাসংক্রান্ত চিঠিপত্র সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

মূল্য—বার্ষিক সডাক ৪৲ টাকা।

আষাঢ় হইতে বর্ষারম্ভ হইলেও বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। মূল্য ও অর্ডার কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৬ বি, বকুল বাগান রো,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

কর্ম্মাধ্যক্ষ
সমসাময়িক।

সমসাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র

সমসাময়িক

ত্রৈমাসিক পত্র

প্রথম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৪৭ | দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় আলোচনা		১২৯
আধুনিক ভাস্কর্যে নূতন ধারা	শ্রীঅবনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৪৫
বাংলা গদ্যের কয়েকটি সমস্যা	শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী	১৫৬
সভ্যতা	ক্লাইভ বেল	১৬৫
ধ্রুপদ	শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৫
বর্ত্তমান পলিটিক্‌সের পথ	গোপাল হালদার	১৮৩
কবি সুকুমার রায়চৌধুরী	শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল	২০১
বর্ত্তমান যুদ্ধে নৌবল	শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী	২১৫
কবিতা (১) অনেক দূর সে গৌরী নদীর চরে— (২) মুক্তকটিক	শ্রীঅশোককুমার মৈত্র	২৩৫-২৩৬
(৩) চতুর্দ্দশী—	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	২৩৭
(৪) আদিম আরণ্য শিশু—	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩৮
(৫) সনেট (৬) ঐ	গোপাল হালদার	২৩৯-২৪০

এই সংখ্যায় প্রকাশিত সব প্রবন্ধের স্বত্ব লেখক ও প্রকাশক কর্ত্তৃক সংরক্ষিত।

অনিবার্য্য কারণে 'আশ্বিন' সংখ্যা প্রকাশে বহু বিলম্ব হইয়া গেল। 'পৌষ' ও 'চৈত্র' এই দুই সংখ্যা বৈশাখের পূর্ব্বেই বাহির হইবে।

পুস্তক সমালোচনা

(১) সানাই	গোপাল হালদার	২৪১
(২) শিলালিপি	শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল	২৪৪
(৩) একদা ধাত্রীদেবতা	শ্রীকরালীকান্ত বিশ্বাস	২৪৮
(৪) সন্ধানে	শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৫৪
(৫) ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ	শ্রীশম্ভুচন্দ্র চৌধুরী	২৫৫
(৬) ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ	শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী	২৫৮

দক্ষিণ কলিকাতার

অভিজাত প্রস্থানস্থ

স্কুল কলেজের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক, বালক বালিকাদের উপহারের ইংরেজী ও বাংলা পুস্তক, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গ্রন্থ, এবং ত্রৈমাসিক 'সমসাময়িক' এখানে পাওয়া যায়। সাহিত্য-রসিকের সমর্থন ও সেবাই আমাদের কাম্য।

রত্নাকর পাব্লিশিং হাউস

২৪২ এফ্, রসা রোড

(আশুতোষ কলেজের সম্মুখে)

সম্পাদকীয় আলোচনা

দ্বিতীয় সংখ্যা 'সমসাময়িক' প্রকাশ করিতে অযথা বিলম্ব হইয়া গেল। কারণ অনিবার্য্য হইলেও সাময়িক পত্রের পক্ষে ইহা গুরুতর ত্রুটি। ইহার জন্য পাঠক ও গ্রাহকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তবে ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে প্রথম বৎসরের বাকী দুই সংখ্যা প্রকাশিত হইবে ও দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যা আগামী আষাঢ় মাসে যথাসময়ে বাহির হইবে।

* * *

পাঠকসমাজ প্রথম সংখ্যা 'সমসাময়িক'কে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এই ধরণের পত্রের পক্ষে আনন্দ ও উৎসাহের কথা, আমাদের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সমালোচকগণও আমাদিগকে অনুগ্রহের চক্ষেই দেখিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যাঁহারা আমাদের দুই একটা দোষত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছেন তাঁহাদের নিকটও আমরা কৃতজ্ঞ। কাগজটিকে যে ভাবে পরিচালনা করিব বলিয়া আমরা মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহার সবটুকু এখনও কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। করিবার পথে বাধা কি, তাহা বয়োজ্যেষ্ঠ পত্রের সম্পাদকগণের কাছে অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়। এই সকল বাধা কাটাইয়া উঠিবার প্রাণপণ চেষ্টা আমরা করিতেছি, কিন্তু এই প্রচেষ্টায় সাফল্য সময়সাপেক্ষ। আশা করি প্রথম বর্ষ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পত্রিকাখানি ঈপ্সীত রূপ ধারণ করিতে পারিবে।

* * *

একটি বাধা যে এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে তাহা সম্পাদকীয় কার্য্যের কিছু অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আমরা আগে কিছুতেই অনুমান করিতে পারি নাই। সে বাধাটি একেবারে গোড়ায় গলদ—অর্থাৎ রচনার অপ্রাতুল্য। এথেন্সবাসীদের বাইবেল আছে যে, তাহারা সারাদিন অতিবাহিত করিত শুধু কি নূতন জিনিষ দেখা দিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কথা বলিয়া বা কথা শুনিয়া। এই ব্যাপারে আমরা বাঙালীরা এথেন্সবাসীদের সমধর্ম্মী বলিয়া একটা ধারণা প্রচলিত ছিল। অন্তত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এতটুকু যন্ত্র হইতে এত শব্দ হয় বলিয়া স্বজাতিকে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এত বড় বাক্‌পটু জাতির লেখনীর বেলাতে এমন মৌনতা বিস্ময়কর। অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, বাক্‌ব্যবসায়ী ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও অধ্যাপক যেন এই বিষয়ে আরও সংযমী। ডিজরালী একবার প্রতিপক্ষের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাদের প্রত্যেকেই এক একটি নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি। আমাদের আলাময়ী বক্তাদের উদ্দেশ্যেও এই বিশেষণটি প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি? অথবা আরও নিম্নস্তরের একটা ইংরেজী বুকনী আওড়াইয়া বলিব, ইহারা শূন্য বক্তা মাত্র! সে যাহাই হউক, এখন মনে পড়িতেছে, বঙ্গদর্শন, ভারতী, ও সবুজপত্র সম্পাদন করিতে গিয়া যথাক্রমে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীকে স্বনামে ও বেনামে কি পরিমাণ লেখনী চালন করিতে হইয়াছিল। বক্তব্যের বহুমুখীনতায় দূরে থাকুক, ফাউন্টেন পেনের প্রবর্ত্তন সত্বেও কেবলমাত্র কলম পিষিবার ক্ষমতায়ও আমরা ইহাদের সন্নিকটে কখনও পৌঁছিতে পারিব না। সুতরাং 'সমসাময়িকে'র পৃষ্ঠা পূরণ মাত্রও একটা সমস্যা।

* * *

যে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া আমরা দাঁড়াইয়াছি সেই ধর্ম্মকেই ভুল বলিয়া যদি কেহ আমাদের সমালোচনা করেন, তবে সে যুক্তি খণ্ডন করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। শ্রদ্ধেয় 'পরিচয়' সম্পাদক মৃদু ভাবে এই ধরণের একটি আপত্তি আমাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'সমসাময়িকে'র সম্পাদকীয় নীতি সম্বন্ধে গত সংখ্যায় আমরা লিখিয়াছিলাম, "আমরা জ্ঞানযোগের নিষ্কাম অনুসন্ধিৎসার মধ্যে আপাততঃ নিজেদের আবদ্ধ রাখিব। এই নিষ্কাম জ্ঞানযোগের সত্যকার অস্তিত্ব বা মূল্য আছে কি নাই সে প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক বাড়াইব না।" আমরা ইহাও বলি যে, "এই মানসিক 'লেসে ফেয়ার' হাল ফ্যাশানের বিরোধী।" এই সম্বন্ধে 'পরিচয়' সম্পাদক লিখিয়াছেন, "হাল ফ্যাশান বল্‌তে যদি তিনি 'যুগধর্ম্ম' বোঝেন তা হ'লে তাঁর উক্তি না মেনে উপায় নাই। কিন্তু 'ফ্যাশান' বলতে বাংলায় যা বোঝায় এই মানসিক 'লেসে ফেয়ার' মোটেই তার বিরোধী নয়। কেন না, বুদ্ধির মুখোস প'রে প্রগতির আবেগকে বন্ধ করা যে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের চিরকালের ফ্যাশান ইতিহাসবিৎ নীরদবাবুর তা জানা উচিত। নীরদবাবু যে এই প্রতিক্রিয়াপন্থীদের দলভুক্ত তা আমার কল্পনারও অতীত।"

'পরিচয়' সম্পাদক মহাশয়ের আমাদিগকে 'প্রতিক্রিয়াপন্থী' বলিয়া কল্পনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, ইহা আমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের পরিচয়। কিন্তু 'প্রগতির আবেগে' এতটা অচ্ছন্ন না হইয়া জ্ঞানযোগকে আরও একটু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিলে তিনি হয়ত ভাবিতেন, 'প্রতিক্রিয়াপন্থী' বিশেষণে বিশিষ্ট হওয়া

বেশী মারাত্মক না-ও হইতে পারে। যে মহিলা ১৯১৬।১৭ সনে বিলাতী ধরণের পাদুকা ছাড়িয়া নাগরা ধরিয়াছিলেন তিনি 'যুগধর্ম্মী' না 'প্রতিক্রিয়াপন্থী'? আবার যে মহিলা ১৯৩২।৩৩ সালে নাগরা ছাড়িয়া উচ্চতর বা উচ্চতম 'হীল'-যুক্ত জুতা পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন তিনি 'যুগধর্ম্মী' না 'প্রতিক্রিয়াপন্থী'? একই কাজ করিবার জন্য একই ব্যক্তি যদি একবার 'প্রতিক্রিয়াপন্থী' ও আর একবার 'যুগধর্ম্মী' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে আদর্শের সহায়তায় এই বিশেষণ নিরূপণ চলিতেছে তাহার কোন স্থিরতা নাই, কিংবা এই জগতে কোন বস্তু বা আদর্শের চিরন্তন মূল্য নাই, একদিন যাহা সত্য পরদিন তাহা মিথ্যা, একদিন যাহা শুভ আর একদিন তাহা অশুভ। জ্ঞানযোগীর পক্ষে এই আত্মঘাতী কথা স্বীকার করা অসম্ভব। উহা 'ফ্যাশানে'র কথা মাত্র।

* * *

কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা পাদুকার দৃষ্টান্ত দিয়া আসল তর্কে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা সত্যই বিশ্বাস করি, এই ক্ষেত্রে জুতা ও রাজনৈতিক 'থিওরী'র মধ্যে কোন প্রভেদই নাই। সমালোচক ইতিহাসের কথা তুলিয়াছিলেন সেজন্য বলিতে হয়, ইতিহাস পাঠকের নিকট অন্তত একটি জিনিষ স্পষ্ট হওয়া উচিত। সে জিনিষটি এই—কোন বিশ্বাস সত্য কি অসত্য, শুভ কি অশুভ, গ্রহণীয় কি ত্যজ্য তাহা যদি একমাত্র 'যুগধর্ম্মে'র দ্বারা নির্ণয় করিতে হয় তাহা হইলে সত্যান্বেষীর আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। গ্রীস যখন 'টায়রেন্ট'দের উচ্ছেদ করিয়া গণতান্ত্রিক পৌররাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে তখন কি সে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়াছিল? আবার এই গ্রীসেই যখন গণতান্ত্রিক পৌররাষ্ট্রের অবসান হইয়া সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় তখনও কি 'প্রতিক্রিয়া'রই জয় হইয়াছিল? রোম যখন রাজাকে দূরীভূত করিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে তখন সে প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়াছিল কি? আবার রোমেই যখন প্রজাতন্ত্রের জায়গায় স্বেচ্ছাতন্ত্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় তখন 'প্রতিক্রিয়া' আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল কি না তাহাও বিবেচ্য। আর দৃষ্টান্ত দিয়া পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত করিব না। সমসাময়িক জগত হইতে অগণিত দৃষ্টান্ত পাঠকগণ অতি সহজেই দিতে পারিবেন। মোট কথা এই, মানব-ইতিহাসের স্রোত একবার একদিকে অন্য বার ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনটি উন্নতির স্রোত কোনটি অবনতির স্রোত তাহা নির্ণয় করিতে হইলে 'যুগধর্ম্মে'র উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। অবশ্য যে কারণে সত্যকে উপলব্ধি করিতে আমরা পারিতেছি না, তাহা অনেক সময়েই 'যুগধর্ম্ম' নয়—'যুগধর্ম্ম'ও একটা বড় জিনিষ—উহা বাক্যধর্ম্ম মাত্র, ভদ্রতার খাতিরে বাক্‌সর্ব্বস্বতা বলিতে পারিলাম না। কথার—স্লোগানের—নিদারুণ নিগড় আমাদের

বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই বিরুদ্ধবাদীর উদ্দেশ্যে বিশেষণ-বর্ষণকেই আমরা চরম যুক্তি বলিয়া জ্ঞান করি।

* * *

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আমরা গতবারে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা প্রায় সকলেরই মনঃপূত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সত্যই আনন্দলাভ করিয়াছি। অবশ্য দুই এক জন যে ইহাতে একটু বিরক্ত না হইয়াছেন তাহা নয়। ইঁহাদের কেহ কেহ আমাদের ভাষার ভুল ধরিয়া এই বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংশোধনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। নির্ভুল বাংলা লিখি এই অবিনীত স্পর্দ্ধা যেন আমাদের কখনও না হয়।

আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা এই যে ভুলগুলিও যেন বাংলার ভুলই হয়, কেহ আমাদের উপর যেন ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের আধিক্য আরোপ না করেন। বাঙালীদের ভাষা আয়ত্ত করিবার বেশ ক্ষমতা আছে বলিয়া অনেক বিদেশী বলেন। দুঃখের কথা এই, বর্ত্তমান কালে এই ভাষাজ্ঞান একটু বিপরীত ধরণের হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অর্থাৎ আমাদের ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের পরিচয় একমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন আমরা বাংলা লিখি, ও বাংলা জ্ঞানের পরিচয় আমরা তখনই দিয়া থাকি যখন আমাদিগকে ইংরেজী ব্যবহার করিতে হয়। এই 'যুগধর্ম্ম'কে রোধ করিতে —অর্থাৎ 'গুরুত্বপূর্ণ বন্দর' ('ইমপর্‌টেণ্ট পোর্ট') ও 'অংশ গ্রহণ করিলেন না' ('টুক্‌ নো পার্ট') এই শ্রেণীর বাংলা এড়াইয়া চলাই আমাদের আদর্শ। তবে আদর্শ ও কাজের মধ্যে তারতম্য হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে না বলিয়া পারিলাম না যে একটি বিষয়ে ভ্রম-স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। আমরা গত সংখ্যায় 'প্যারিস মহানগরীর পতন' এই বাক্যটিকে অশুদ্ধ বাংলা বলিয়া ইঙ্গিত করি। এই সম্পর্কে 'অলকা' সম্পাদক লিখিয়াছেন এই প্রয়োগ শুদ্ধ ও রীতিসম্মত বাংলা। আমাদের অতিশ্রদ্ধেয় আর এক জন সাহিত্যিক জানাইয়াছেন যে তিনিও উহাকে শুদ্ধ প্রয়োগ বলিয়াই মনে করেন। আমরা কিন্তু ইঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমরা এখনও মনে করি 'প্যারিস মহানগরীর পতন' শুদ্ধ বাংলা রীতির বিরোধী। কেন আমরা এই মত পোষণ করি বলি। ইংরেজী 'ফল্‌' কথাটি পতন বা অবনতি অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনই সামরিক অর্থে অর্থাৎ কোন সুরক্ষিত স্থানের আত্মসমর্পণ অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে (যেমন 'ফল্‌ অফ্‌ দি রোমান এম্পায়ার'; 'ফল্‌ অফ পোর্ট আর্থার')। কিন্তু বাংলায় বা সংস্কৃতে পতন কথাটি একমাত্র প্রথম অর্থেই ব্যবহৃত হয়; যেমন, "মোগল সাম্রাজ্যের পতন", "পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা" ইত্যাদি। কেহ যদি সামরিক অর্থে পতন কথাটির প্রয়োগের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারেন

তাহা হইলে উপকৃত হইব। সুতরাং দেখা যাইতেছে বাংলায় পতন শব্দটি অবনতি বা অধোগতি অর্থে একমাত্র দেশ, সাম্রাজ্য, সমাজ, বা এইরূপ কোন বৃহত্তর বস্তু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম যাহা আমাদের চোখে পড়িয়াছে তাহা 'রোমের পতন'। কিন্তু এখানে রোমের পতনের অর্থ রোমনগরীর আত্মসমর্পণ নয়—রোমক সাম্রাজ্যের পতন।

* * *

প্রথমবারে আমরা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির সহিত বাংলা ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়াছিলাম ও সেই প্রসঙ্গে আমাদের 'কালচার' ও আমাদের মাতৃভাষা লইয়া দুই একটা কথা বলিয়াছিলাম। এইবারে এই বিষয়টির আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাই। বাঙালীর 'কালচার'র অবলম্বন বাঙালীর মাতৃভাষাই হওয়া উচিত ও স্বাভাবিক, নহিলে উহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইতে পারে না, ইহা সাধারণ কথা মাত্র। এই নিয়মেই পৃথিবীর সকল দেশে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই পথ কতদূর অনুসৃত হইতেছে বা হইতে পারে এবং যেখানে অনুসৃত হইয়াছে তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। স্বীকার করিতেই হইবে যে ব্যাপারটা অন্যত্র যত সহজ এখানে তত নয়, কারণ এ বিষয়ে আমাদের নিজেদেরই মনে দ্বিধা ও সংশয় রহিয়াছে। কবিতা উপন্যাস ও গল্পের কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্য বিষয়ের কথা ধরিলে, আমাদের ভাষার গণ্ডী ও সংস্কৃতির আদর্শের মধ্যে একটা বড় রকমের বিরোধ যে রহিয়াছে তাহা সন্দেহের অতীত। ঐ সকল বিষয়ে যাঁহারা কিছু লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আমরা অতি অল্প লোককেই দেখিয়াছি যাঁহারা বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই। ইঁহারা বলেন, বাংলায় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের তিন রকমে ক্ষতি হইয়াছে—প্রথমত বই বিক্রয় হয় নাই; দ্বিতীয়ত, কোন খ্যাতি বা সম্মান হয় নাই; তৃতীয়ত, স্বকীয় বক্তব্য যে উদ্দেশ্যে সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য সফল নাই—এই তিন দিক হইতেই ইংরেজী ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন করিলে সার্থকতা বেশী হইত। আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে এই সকল উক্তি সত্য বলিয়াই জ্ঞান হয়। পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিতে গেলে পুস্তকব্যবসায়ীর নিকট হইতে এই অভিযোগের যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে; পাঠকদের নিকট হইতেও সমর্থনের অভাব হইবে না। আমাদের মধ্যে যদি কেহ ইতিহাস দর্শন সমাজতত্ত্ব রাজনীতি বা সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে চান তবে তিনি বাংলা ছাড়িয়া ইংরেজীর শরণাপন্ন হইবেন ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। ইংরেজী না পড়িয়া কেবলমাত্র বাংলা ধরিলে এই সকল বিষয়ে ব্যুৎপন্ন

হওয়া যাইতে পারে এ ধারণা কাহারও মনে জাগিবে না, এমন কি ইংরেজী বই-এর সঙ্গে বাংলা বইকে একাসনে স্থান দিবার কল্পনাও কেহ করিবেন না। এই কারণে ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, এই সকল বিষয়ে বাংলা বই যখনই রচিত হয় তখনই উহাদের লক্ষ্য হয় ইংরেজী জানে না এমন সব ব্যক্তি। সুতরাং এই সকল পুস্তক নিম্নস্তরের সঙ্কলন বা চুটকী শ্রেণীর পুস্তক হইয়া পড়ে। মাতৃভাষার মৌখিক সম্মান বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এই সত্যটা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।

* * * *

ইহার প্রতীকার কি? প্রতীকার যে নাই তাহা নয়, কিন্তু উহা সহজ নয়, কারণ বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহার যথাযোগ্য আসনে বসাইতে হইলে আমাদিগকে বহুদিনের দৃঢ়বদ্ধ একটা অভ্যাস ছাড়িতে হইবে। জানি না সকলে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, কিন্তু একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলেই হয়ত ধরিতে পারিবেন, একই শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজী ও বাংলা পুস্তককে এক আদর্শে বিচার করেন না, ইংরেজীর ক্ষেত্রে উচ্চতম ও বাংলার বেলাতে নিম্নতম আদর্শ অবলম্বন করেন। ইহাকে কেহ হয়ত বাংলার প্রতি স্নেহ বা অনুরাগের প্রমাণ বলিয়া জ্ঞান করেন, আমরা কিন্তু উহাকে বাঙালী লেখকের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার পরিচয় বলিয়া মনে করি। বাংলা পুস্তককে যাঁহারা নিম্নতম আদর্শে বিচার করেন তাঁহারা স্বভাবতই ধরিয়া লন বাঙালী লেখক উচ্চতম আদর্শের কষ্টিপাথরে উৎরাইবেন না। ইহার অপেক্ষা গ্লানির কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই ব্যাপারের দৃষ্টান্ত প্রতিদিনই দেখিতে পাই। ইহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, আমাদের সংস্কৃতিগত জীবনে একটা দ্বিত্ব দেখা দিতেছে; আমাদের বাহ্যিক জীবনযাত্রার মত মানসিক জীবনেও সদর ও অন্দরের মধ্যে পার্থক্য বেশ তীব্র হইয়া উঠিতেছে, একদিকে যেমন লোকদেখান দোকান সাজাইবার অভ্যাস বাড়িতেছে অন্যদিকে ঘরের ভিতরের দৈন্য তেমনই গা-সহা হইয়া যাইতেছে। আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দ্বিত্বের ফল মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।

এই ত গেল শিক্ষিত বাঙালীর অন্তর্বিরোধের কথা। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যাও বাঙালী সমাজে ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। ভদ্র বাঙালী সমাজে এখন স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সংস্কৃত-অসংস্কৃত, শহর-মফস্বলের বিভেদ কমিয়া আসিতেছে, ভদ্র বাঙালী সমাজ ধীরে ধীরে একটি রঙে ছোপান ও একই সুরে বাঁধা হইতেছে। কিন্তু এই সমাজের একীভূত রং ও রূপ যাহা দাঁড়াইতেছে তাহা আরও ভয়াবহ, কারণ উহার আদর্শ পাশ্চাত্যের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আদর্শ, উহাদের রুচিও সেই শ্রেণীর, উহার শিক্ষা সেই স্তরের অপেক্ষাও

নিম্নস্তরের। প্রমাণ-স্বরূপ বাঙালী ভদ্রসমাজে সিনেমা ও ফুটবলের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিগত যুগে ভদ্র বাঙালী পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের, বিশেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ইংরেজ সম্প্রদায়ের 'হিউম্যানিজ্‌ম'-র আদর্শ অনুকরণ করিতে চেষ্টা পাইত; সব সময়ে যে সাফল্য লাভ করিতে পারিত তাহা নয়, কিন্তু মোটের উপর আদর্শের বেশী দুর্গতি করে নাই। বর্ত্তমানে ভদ্র বাঙালী সম্পূর্ণ অন্যধর্ম্মী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ পাশ্চাত্য 'প্রিমিয়ানিজ্‌ম' আমাদের ঘাড়ে বেশ ভাল করিয়া চাপিয়াছে, উহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কিছুই আমাদের নাই।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহারা অন্তরে এইরূপ অমার্জ্জিত হইয়া দাঁড়াইতেছেন তাঁহাদের কেহই বাহ্যিক আচার-ব্যবহার বা সামাজিক মর্য্যাদায় নিম্নস্তরে থাকিতে চান না। এক কথায় আমাদের বস্তুগত 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ্ লিভিং'-এর সহিত সংস্কৃতিগত 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ্ লিভিং'-এর সামঞ্জস্য ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, অনেক ক্ষেত্রে একেবারে লোপ পাইয়া যাইতেছে। একটা উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী কথার কি অধোগতি আমাদের মধ্যে হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিলেই ইহার অনেকটা পরিচয় দেওয়া হইবে। 'অ্যারিষ্টোক্র্যাট' বা 'অ্যারিষ্টোক্রেসী' ইংরেজী ভাষায় সত্যকার অভিজাত শব্দ; 'অ্যারিষ্টোক্র্যাট' বলিয়া যাঁহাদের অভিহিত করা হয় তাঁহারা মানসিক ও সামাজিক ধর্ম্মে সত্যই উন্নত, ইতর-সাধারণ হইতে বিভিন্ন। অথচ আমাদের মধ্যে উহা বিত্তবান অভদ্র ব্যক্তি অর্থেই বেশী প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান, অর্থাৎ ইঙ্গ-ভারতীয়, যুগে বাঙালীর সংস্কৃতির চরম বিকাশ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হইয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ষোল-সতর বৎসরেও তাহা অনেকটা বজায় ছিল, কিন্তু তাহার পরই এই 'কালচারে' ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কারণ নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়, তবে এই আলোচনা সংক্ষেপে সম্ভব নয় বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিতেছি। আজ শুধু এইটুকু বলিব যে এই অবনতি অনিবার্য্য নয়; স্পেঙ্গলেরীয় নিরাশাবাদের বশে ইহাকে আমাদের জাতীয় অদৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। এই অবনতি আমাদের স্বকৃতকর্ম্মের ফল, উহার প্রতীকারও আমাদের আয়ত্তাধীন। তবে চেষ্টা হইবে কিনা, চেষ্টা করিবার মত দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় আমাদের আছে কিনা তাহা বিচারের বিষয় হইতে পারে।

বাঙালীর আত্মপ্রত্যয় নাই ইহা বলিলে অনেকেরই আশ্চর্য্য ঠেকিবে; কারণ বাঙালীর সত্যকার অবস্থা যাহাই হউক সে মনে মনে সর্ব্বদাই নিজের

শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী, তাহার প্রমাণ আমরা প্রতিদিনই পাইয়া থাকি। এই ধারণাকে আত্মপ্রত্যয় না বলিয়া বরং আত্মপ্রীতি বলা উচিত। যে জাতি নিজের দোষ-ত্রুটি সাদা চোখে দেখিতে পারে না, দোষ-ত্রুটি স্বীকার করিলে আত্মাভিমানে এমন আঘাত লাগে যে আত্মসম্মান পর্য্যন্ত হারাইয়া বসে, তাহাকে আত্মবিশ্বাসী বলা উচিত নয়। সত্যকার আত্মপ্রত্যয় আরও ঘাতসহ।

আমাদের মেকী আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে আর একটি দুর্ব্বলতা আসিয়া জুটিয়াছে—শ্রমবিমুখতা। এই শ্রমবিমুখতাকে আমরা বুদ্ধিমত্তা, ভাবপ্রবণতা, আদর্শপ্রবণতা প্রভৃতির মুখোসে ঢাকিতে চাই। কিন্তু আসলে উহা আলস্য। এই আলস্যের জন্যই আমরা সকলদিকেই অক্ষমতা বা 'ইনএফিসিয়েন্সি' দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছি। সাহিত্যিক 'ইনএফিসিয়েন্সি'র বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দৈবক্রমে সম্প্রতি চক্ষে পড়িল। নয়টি আধুনিক বাংলা গল্পের একটি সঙ্কলনে লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই লেখকদের এক জন সুপরিচিত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাঁহার সাহিত্যজীবনের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে উহার একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—"মধ্যে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯২২-১৯৩০ সাল, এই আট বৎসর ভ্রাম্যমান জীবন আরম্ভ হয়। এই সময়ের মধ্যে পূর্ব বঙ্গের নানাস্থানে চট্টগ্রামের অরণ্যাবৃত পার্বত্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সেই গিরি ভ্রমণের সময়ে লেখা বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'।"

আশ্চর্য্যের কথা এই, উপরোক্ত বিবরণের একটি সংবাদও ঠিক নহে। ১৯২২ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত বিভূতিবাবু বেকার বা ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করেন নাই; পূর্ব্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা তাঁহার খুবই কম; চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে তিনি কখনও পরিভ্রমণ করেন নাই; 'পথের পাঁচালী' সেই সময়ে লিখিত হয় নাই। ১৯২২ সনের শেষে তিনি কলিকাতার রমানাথ ঘোষের ষ্টেটে কার্য্য গ্রহণ করেন, প্রথম বৎসর কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটায় কাজ করেন, ও তাহার পর ভাগলপুরে যান। ভাগলপুরে তিনি ১৯২৪-২৫-২৬-২৭ সনে ও ২৮ সনের আন্দাজ মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ছিলেন। সেই সময়েই 'পথের পাঁচালী' লিখিত হয়। ইহার পূর্ব্বে 'পথের পাঁচালী'র দুই একটি অধ্যায় খসড়া আকারে লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু সেই প্রথম খসড়ার অনেক জিনিষই বাদ গিয়াছে। এক জন জীবিত লেখকের দুই লাইন পরিচয় দিতে গিয়া এই কল্পনার খেলা প্রদর্শনের কারণ কি? ইহা কি অতিবুদ্ধিমান বাঙালীর ভাবপ্রবণতার ফল, না নির্জ্জলা অকর্ম্মণ্যতা? নয়টি সংক্ষিপ্ত জীবনী দিতে গিয়া যদি আমরা এইরূপ 'ইন্‌এফিসিয়েন্সি'র পরিচয় দিই তাহা হইলে ইংরেজী 'হুজ্‌-হু'-র মত পুস্তকের চল্লিশ হাজার জীবনীর বেলাতে আমরা কি করিতাম ভাবিলেও ভয় হয়। শুধু

জীবনীই নয়, বাঙালী গ্রন্থকারের রচিত যে কোনও বই-এ ভুরি ভুরি ভুল না পাওয়াই এখন নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

* * * *

দৈনন্দিন রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনা ত্রৈমাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়, তবু কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপারের অবতারণা না করিয়া পারিতেছি না; কিন্তু এই সূত্রে আগেই বলিয়া রাখিতেছি যে, আমাদের আলোচনার উপলক্ষ্য রাজনৈতিক ঘটনা হইলেও উহার সত্যকার লক্ষ্য রাজনৈতিক আসরের নেপথ্য—অর্থাৎ মানসিক 'ব্যাকগ্রাউণ্ড'। প্রথমে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্দ্ধানের কথাই ধরা যাউক। সুভাষবাবু যে ভাবে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ও যে ভাবে আত্মগোপন করিয়া আছেন তাহাতে দেশবাসী, সরকার, পুলিশ, সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার অপেক্ষাও আশ্চর্য্য—প্রায় প্রত্যেকটি বাঙালীকে নিজের উদ্দেশ্য ও প্ল্যান সম্বন্ধে খুঁটানুপুঙ্খ সংবাদ দিয়া সুভাষবাবু কি করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে যাইতে সমর্থ হইলেন এবং কি করিয়া অজ্ঞাতবাস করিতে সক্ষম হইতেছেন। কথাবার্ত্তায় মনে হয়, সুভাষবাবু কেন, কি ভাবে, কোথায় গেলেন, কোথায় আছেন, কোথায় থাকিবেন, কি করিবেন তাহা একমাত্র তাঁহার নিকট আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর সকলেরই সুপরিজ্ঞাত।

শুধু সুভাষবাবুর ব্যাপারেই নয়, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রাজনৈতিক চালের অভিসন্ধি ও কার্য্যকারণ, রাজনৈতিক ঘটনার গোপন খবর এই সকল চাল ও ঘটনার সহিত যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণ বেশী জানে। মহাত্মা গান্ধী কখন কি করিতেছেন, কি করিতে ইচ্ছা করেন, বিলাতে কি ঘটিতেছে, হেয়ার হিটলারের উদ্দেশ্য কি, এ বিষয়ে যত খবর উকীল লাইব্রেরী ও চায়ের দোকান হইতে আসিয়াছে বালিনের হিন্দুস্থানী বেতারবক্তাও এত তথ্য দিতে পারেন নাই।

* * * *

বর্ত্তমানে বাংলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাজনৈতিক হুজুগ অবশ্য সেন্সস্। রাজনৈতিক যুক্তিতর্কে নিয়মিতভাবে সেন্সসের অবতারণা বাঙালী লেখকদের মধ্যে প্রথমে করেন বোধ হয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। কিন্তু তিনিও সেন্সসকে যুক্তি ও হিসাবের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এবারের সেন্সস বৈজ্ঞানিক

অনুসন্ধানের স্তর হইতে নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বের স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এ ব্যাপারে অগ্রণী হন বাংলার হিন্দু মহাসভার নেতারা। আমাদের শাসনতন্ত্র সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সেন্সসের হিসাবই উহার আসল ভিত্তি। ১৯৩১ সনের সেন্সসে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যার যে তারতম্য দেখান হইয়াছে, আসল তারতম্য তত বেশী নয়, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত হেতু আছে। উহাতে হিন্দুর সংখ্যা কম প্রদর্শিত হইবার কারণ আংশিকভাবে আমাদের শৈথিল্য ও আংশিকভাবে কংগ্রেস কর্ত্তৃক সেন্সস বয়কটের চেষ্টা। এই ভুলের পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয়, সেজন্য বাংলার হিন্দুসভার নেতারা পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান হইয়াছিলেন। এবারে বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা যদি যথাযথভাবে প্রদর্শিত হয় তাহা হইলে উহার কৃতিত্ব হিন্দুসভার নেতৃগণের প্রাপ্য।

কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলে মুসলমান নেতৃবৃন্দের, এবং বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবের বিশেষ ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, এই বৎসরের সেন্সসে হিন্দুর সংখ্যা কেবলমাত্র যে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা গিয়াছে তাহাই নয়, মুসলমানের অপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে এই আভাষ পাইয়াই ফজলুল হক্ সাহেব এত উত্তেজিত হইয়াছেন। হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে এই সংবাদ ঠিক বলিয়া মনে হয় না, তবে মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাহাতে না কমে উহা যে হক্ সাহেবের অভিপ্রেত তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ইচ্ছা পোষণ করিবার জন্য হক্ সাহেবকে দোষ দেওয়া উচিত হইবে না; বরঞ্চ দুই একটি পত্র হক্ সাহেবের উদ্দেশ্যে যে ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন উহার সমর্থন কিছুতেই করা যায় না। তবে এই বিষয়ে হক্ সাহেবও পদোচিত বাক্‌সংযম বা গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অন্যেরা যদি সেন্সসকে নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে পরিণত করিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী পরিণত করিয়াছেন খেউড়ে। স্যর সেকেন্দর হায়েত খাঁ ও ফজলুল হক সাহেব, ভারতবর্ষের এই দুই জন মুসলমান প্রধানমন্ত্রীর কথাবার্ত্তা ও আচরণের বৈষম্য সকলেরই চোখে বিসদৃশ ঠেকিতেছে।

সেন্সসের ফলাফল যাহাই হউক উহা হইতে রাজনৈতিক অবস্থার ইতর-বিশেষ হওয়ার আশু সম্ভাবনা আছে, এই ধারণা পোষণ করা হিন্দু সাধারণের পক্ষে সমীচীন হইবে না। মনে রাখা উচিত, বাংলা দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রে বর্ত্তমানে মুসলমানদের যে প্রাধান্য উহা কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যের ফল নয়। তাঁহারা দৃঢ়তা, ঐক্য, ও রাজনৈতিক বুদ্ধির দ্বারা এই শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন; যে প্রাধান্য তাঁহাদের বর্ত্তমানে রহিয়াছে উহা তাঁহারা স্বেচ্ছায় বা সহজে ছাড়িবেন না,

সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ হইলেও নয়। রাজনৈতিক অধিকারের প্রধান কারণ দৃঢ়তা ও ঐক্য, সংখ্যাধিক্য নয় ইহা যেন আমরা না ভুলি।

* * * *

মুসলমানগণ সংখ্যায় রাজনৈতিক অধিকারে, আর্থিক সুযোগ-সুবিধায় হিন্দুর সমান হইতে চান, ইহা আশ্চর্য্যের কথা নয়। কোনও হিন্দু তাঁহাদের এই ইচ্ছাকে অযৌক্তিক মনে করিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের 'লেবেন্‌স্‌রাউমে'র দাবি (অথবা পুরাতন রীতি অনুসারে বলা যাইতে পারে, 'প্লেস ইন্ দি সান্'-এর দাবি) তীব্র হইতে তীব্রতর, অসহিষ্ণু হইতে অসহিষ্ণুতর হইয়া অন্যের অস্তিত্বের দাবিকেও ছাপাইয়া উঠিতেছে ইহাই মুস্কিলের কথা। এই দাবিকে জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকার দিবার প্রাণপণ চেষ্টা হইতেছে। মিঃ এম. এ. জিন্না সেদিনও বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র 'নেশন্'। বলা বাহুল্য মিঃ জিন্না ভারতীয় মুসলমানগণকে ইউরোপীয় অর্থে 'নেশন' বলিয়াই প্রচার করিতে চাহেন। আর যাহাই হউক এই সংজ্ঞা ইস্‌লামের ইতিহাসের দ্বারা অনুমোদিত হইবে না, কারণ ইস্‌লাম কখনও নিজেকে "জাতীয়" সমাজ বলিয়া ঘোষণা করে নাই, "জাতীয়" সমাজের রূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই—করিয়াছে "আন্তর্জ্জাতিক" সমাজ রূপে। বিশিষ্ট দেশ, জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির—এক কথায় 'ন্যাশনালিজ্‌মে'র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মের দ্বারা একীভূত একটা বিশ্বজনীন সমাজ সৃষ্টি করাই ইস্‌লামের আদর্শ ছিল; কার্য্যক্ষেত্রেও উহার এই আদর্শ বহুলাংশে সফল হইয়াছিল। এই দিক হইতে কম্যুনিজ্‌মের সহিত ইস্‌লামের বেশ একটা সাদৃশ্য আছে। 'কম্যুনিজ্‌মে'র মত ইস্‌লামও দেশকালপাত্রগত বিশিষ্টতার বিরোধী।

এইজন্য ইস্‌লাম যে দেশেই বিস্তারলাভ করিয়াছে সেইখানেই পুরাতন জাতীয়তার সহিত উহার একটা সংঘর্ষ বাধিয়াছে। ইস্‌লামের প্রথম যুগে অবশ্য ইসলামের সম্মুখে জাতীয়তা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, কিন্তু জাতীয়তা ও ইসলাম বিপরীত ধর্ম্মী হওয়াতে সম্পূর্ণভাবে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী দেশেও অন্তর্বিরোধের ছায়া কখনও কাটিয়া যায় নাই। বর্ত্তমান যুগে এই অন্তর্বিরোধ যে শুধু স্পষ্টহইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই নয়, এক ভারতবর্ষ ভিন্ন সর্ব্বত্র ইস্‌লামকেও ছাপাইয়া উঠিতেছে। এই ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফলেই মুসলমান পারস্যে ইরাণীয় জাতীয়তার পুনরাবির্ভাব হইয়াছে; তুর্কী খিলাপৎ ছাড়িয়া তুরাণী জাতীয়তাকে অবলম্বন করিয়াছে। ভারতবর্ষেরমু মুসলিম লীগের নেতারাও হয়ত অনুভব করিতেছেন যে, ইউরোপীয় ন্যাশনালিজ্‌মের জোয়ারের মুখে ইস্‌লাম ও মুসলমান সমাজের পুরাতন

রূপ বজায় রাখিতে পারা যাইবে না, তাই ভারতীয় মুসলমানের জন্য অন্তত একটা দেশ (পাকিস্তান) গঠন করিয়া, ভারতীয় মুসলমান সমাজকে একটা 'নেশন' বলিয়া ঘোষণা করিয়া মুসলিম সংগঠনের একটা যুগোচিত রূপ দিতে হইবে। কিন্তু যে দুই জিনিষের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন সামঞ্জস্য নাই উহাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা তাঁহারা মিথ্যা করিতেছেন। ইস্‌লামকে একটা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিলে উহা আর ইস্‌লাম থাকিবে না ; ইস্‌লামের বিশ্বমুখীনতা নব্য ন্যাশনালিজ্‌মের সম্পূর্ণ বিরোধী।

* * *

শীত কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা ঔৎসুক্য ও উত্তেজনার ভাব জাগিয়া উঠিতেছে। গত বৎসরের নজীরে সকলেই মনে করিতেছেন, এইবারে জার্ম্মেনি বড় রকমের একটা কিছু করিবে। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার আয়োজন যে হইয়াছে বা হইতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হেয়ার হিটলার সেদিনও বলিয়াছেন, তিনি যে সময় অযথা নষ্ট করেন নাই জগৎ শীঘ্রই তাহা বুঝিতে পারিবে। তবু বলা প্রয়োজন, গতবার ও এবারের মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ে গুরুতর প্রভেদ আছে। গত মার্চ্চ মাসে জার্ম্মেনির সামরিক লক্ষ্য সম্বন্ধে যেমন স্পষ্ট ধারণা ছিল, কি উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে সে বিষয়েও ধারণা তেমনই পরিষ্কার ছিল। বস্তুত ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে যুদ্ধ করিবার জন্যই মুখ্যত জার্ম্মান সেনাবাহিনী গঠিত ও শিক্ষিত হইয়াছিল। ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪০ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত জার্ম্মেনি যে পশ্চিম ইউরোপে কিছুই কি নাই, তাহা প্ল্যান্ বা উদ্দেশ্য অনির্দ্দিষ্ট থাকার জন্য নয়, আয়োজন সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া ও কাল উপযোগী নয় বলিয়াই। এবারে জার্ম্মেনির কৃতা কি তাহা সুস্পষ্ট থাকিলেও কি উপায়ে উহা সিদ্ধ হইতে পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। জার্ম্মেনি সেনাবলে প্রধান ও 'কন্টিনেন্টাল পাওয়ার' ; গ্রেট ব্রিটেন নৌবলে প্রধান ও 'ম্যারিটিম পাওয়ার'। এ দুইএর মধ্যে সাক্ষাৎ ও সরাসরি ভাবে শক্তি পরীক্ষার অবকাশ এত কম যে, জার্ম্মান সেনাধ্যক্ষগণ এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ফ্রান্সকে যে ভাবে পরাভূত করা হইয়াছিল গ্রেট ব্রিটেনকে সে ভাবে আক্রমণ করিতে হইলে সমুদ্র পার হইয়া ইংলণ্ডে নামিবার চেষ্টা করিতে হয়। হেয়ার হিটলার ও তাঁহার সামরিক পরামর্শদাতারা উহার জন্য আংশিক আয়োজন যে না করিয়াছেন তাহা নয়। কিন্তু এই চেষ্টা এত বিপদসঙ্কুল ও উহাতে পরাজয়ের সম্ভাবনা এত বেশী যে অপরিমিত আত্মবিশ্বাস সত্বেও হিটলার অন্য উপায় থাকিতে এই পথ ধরিবেন কিনা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু অন্য উপায় যাহাই থাকুক,

উহা ইংলণ্ডকে আক্রমণ করিবার মুখ্য উপায় হইতে পারে না,গৌণ উপায় হইতেবাধ্য। যেমন, গ্রীসকে বা তুর্কীকে আক্রমণ করিয়া বা স্পেনের ভিতর দিয়া উত্তর আফ্রিকায় গিয়া গ্রেট ব্রিটেনকে বিব্রত করা। ইহার মধ্যে হিটলার কোন পথ ধরিবেন তাহা তিনি ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পারে না ; এমন কি তিনিও এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন কিনা সংশয়স্থল। এই গৌণ প্রচেষ্টার জন্যও অনেক দিক হইতে সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন, আয়োজন সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, এই সকল চেষ্টার দ্বারা যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবে না ; শীঘ্র যুদ্ধ শেষ করিতে হইলে গ্রেট ব্রিটেনকে সাক্ষাৎভাবে আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত করিতে হইবে।

সুতরাং জার্ম্মেনির দিক হইতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন আভাষ যে আসিতেছে না উহা খুবই স্বাভাবিক। ইহার ব্যতিক্রম একটি মাত্র ব্যাপারে হইয়াছে। হিটলার বলিয়াছেন, শীঘ্রই সাবমেরিনের দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনের বাণিজ্য চলাচলের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হইবে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে গ্রেট ব্রিটেনের মত 'ম্যারিটিম পাওয়ার'কে বিপন্ন করিবার জন্য 'ম্যারিটিম' অস্ত্র প্রয়োগ ভিন্ন অন্য উপায় সম্বন্ধে জার্ম্মেনি এখনও চরম সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই।

আর একটি বিষয় বিবেচনা করিলেও মনে হয়, শুধু আয়োজনের অসম্পূর্ণতাই জার্ম্মেনির কিছু না করিবার কারণ নয়, এই নিশ্চেষ্টতার মূলগত হেতু গ্রেট ব্রিটেনকে আক্রমণ করিবার উপায় সম্বন্ধে দ্বিধা। গ্রেট ব্রিটেনকে আক্রমণ করিবার যে সকল উপায় জার্ম্মেনির আয়ত্তাধীন ছিল, উহার দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনকে আক্রমণ করিতে জার্ম্মেনি কোন দিক হইতে শৈথিল্য করে নাই। গত কয়েক মাসের মধ্যে জার্ম্মেনি এরোপ্লেন ও সাবমেরিনের দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টায় যে জার্ম্মেনির যথাসাধ্য শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত হয় নাই তাহা সম্ভব নয়। হয়ত বা এরোপ্লেনবাহিনী ও সাবমেরিন বহরকে আরও বড় ও শক্তিশালী করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া জার্ম্মেনি এই কয় মাস স্বেচ্ছায় বিশেষ কিছু করে নাই তাহা সত্য হইতে পারে না। গত এপ্রিল মাসের 'অফেন্সিভে'র পূর্ব্বেকার নিষ্ক্রিয়তা ও এবারের অবস্থার মধ্যে এইখানেই একটা গুরুতর প্রভেদ রহিয়াছে।

* * *

যুদ্ধের প্রত্যেক পর্ব্বের খুঁটিনাটি হিসাব অপেক্ষা চরম ফল কি হইবে সেই বিষয়েই আমাদের দেশের সাধারণের বেশী কৌতূহল। কিন্তু এ বিষয়ে জোর করিয়া কিছু না বলাই ভাল। গত এপ্রিল মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা ইংরেজ বা ফরাসী জাতি ত কল্পনা করিতে পারেই নাই, এমন

কি নিরপেক্ষ দেশও অনুমান করে নাই। আবার গত জুন হইতে বর্ত্তমান মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ এমন ভাবে চলিয়াছে যাহা অনেক নিরপেক্ষ দ্রষ্টা সম্ভব বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, নাৎসী ভক্তগণ ত ভাবিতেই পারেন নাই। ইহার পর যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করিবার কাজ জ্যোতিষীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই নিরাপদ। তবে মোটের উপর একটা আন্দাজ করা হয়ত সম্ভব। সে আন্দাজ এই—ঠিক আজিকার বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খবর না জানিয়া যদি কিছু বলিতে হয় তাহা হইলে বলা উচিত যে দুই পক্ষেরই এখন পর্য্যন্ত জিতিবার সমান সম্ভাবনা, বরঞ্চ ব্রিটেনের জিতিবার একটু বেশী সম্ভাবনা। আগামী জুন মাসে আর এই সংশয় থাকিবে না, তত দিনে হয় জার্ম্মেনি জিতিয়া যাইবে, নহিলে তাহার পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে, তা সে পরাজয় যেদিনই হউক। এই কয় মাসে জার্ম্মেনি জিতিয়া যাইবে কি না সে বিষয়ে নানা লোক নানা মত পোষণ করিবেন ইহা অনিবার্য্য। তবে আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত হিসাবে এইটুকু বলিব, জার্ম্মেনি আগামী জুন মাসের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনকে পরাজিত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। হয়ত ব্রিটেনের ক্ষতি অনেক হইবে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অসুবিধাও অনেক ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু মোটের উপর ইংরেজ জাতি এই ধাক্কাও সামলাইতে পারিবে।

* * *

আমরা জানি বেশীর ভাগ শিক্ষিত বাঙালীরই এই কথাটা মনঃপূত হইবে না। কিন্তু এ ব্যাপারে শিক্ষিত বাঙালীর বুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রশংসা করা যায় না। রাজনৈতিক কারণে তাহার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন। গত যুদ্ধের সময়ে যদিও আমাদের বয়স খুবই অল্প ছিল তবু সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালী চারি বৎসর ধরিয়া কি বলিয়াছিল তাহা আমাদের বেশ স্মরণ আছে। বলাই বাহুল্য সেই সব কথার একটি কথাও যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি চলিয়াছে, কিছু মাত্র ইতরবিশেষ হয় নাই। গত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও এই যুদ্ধে জয়লাভের আশা জার্ম্মেনি যে করিতেছে উহার পিছনে একটা যুক্তি আছে। গত যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে জার্ম্মান জাতি সেই যুদ্ধের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে যে, কতকগুলি বিশেষ ত্রুটির জন্য তাহারা গতবারে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এই ধারণা হওয়া মাত্র গত বারের ভুল ও আয়োজনের ত্রুটি সংশোধনের জন্য জার্ম্মান

জাতি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে এই বিশ্বাস আছে বলিয়া জার্ম্মান জাতি এবারে জয়ের আশা করিতে পারিতেছে। যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিন্তু এইরূপ কোন অনুসন্ধানের ফল নয়; উহা যুক্তিহীন কল্পনা; দুর্ব্বলের ভরসাহীন আশা মাত্র।

একটা কথা আমরা কিছুতেই যেন বুঝিতে পারিতেছি না যে, বর্ত্তমান যুদ্ধকে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের চক্ষে না দেখিয়া রাজনৈতিক কর্ম্মের আনুষঙ্গিক হিসাবে দেখিলেও উহার কারণ, গতি, ও পরিণাম সম্বন্ধে যথাসম্ভব নির্ভুল হিসাব রাখা একান্ত আবশ্যক, নহিলে আমাদের কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মপদ্ধতিতে গুরুতর ভুল ঘটিবার সম্ভাবনা। আমাদের মনে হয়, এই নির্ভুল হিসাবের কোন চেষ্টা না করাতে আমাদের যে ক্ষতি এখনই হইয়া গিয়াছে তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা কম। এখনও ধীর ভাবে বিবেচনা করিলে ভুল খানিকটা হয়ত শোধরান যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের আবেগপ্রবণতার জন্য উহার সম্ভাবনা ও কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

* * *

পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইটালীর সাম্রাজ্য অবসান হইতে বসিয়াছে, উহা আর বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ইহা আমাদের ভারতবাসীদের পক্ষে দুই দিক হইতে আনন্দের কথা। প্রথমত, আমাদের নিজেদের স্বার্থের দিক হইতে দেখিলে, ভারত-মহাসাগরের উপকূলে শত্রুর বা শত্রু হইতে পারে এরূপ কোন দেশের ঘাটি থাকিতে দেওয়ার অর্থ ভারতবর্ষের সামরিক বিপদ ও সামরিক ব্যয় দুইই বাড়ান। ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া দখলের পর হইতেই ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থ শহর ও বন্দরগুলির রক্ষার ব্যবস্থা বাড়াইতে হইয়াছিল। উহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীকে সমুদ্র পথে আক্রমণ ঠেকাইবার কথা কখনও চিন্তা করিতে হয় নাই। ১৯৩৫ সালের শেষের দিকে ও ১৯৩৬ সনের গোড়ার দিকে প্রথমে এই সকল ব্যবস্থার কথা শোনা যায়। এমন কি বর্ত্তমান যুদ্ধের আগে অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে যোগ দিয়াই ইটালী আকাশ পথে করাচী বা বোম্বাই আক্রমণের চেষ্টা করিবে, কিংবা মাসাওয়াতে ইটালীর যে সকল যুদ্ধজাহাজ আছে সেগুলি বাহির হইয়া আসিয়া এমডেনের মত ভারতবর্ষের চারিদিকে উপদ্রবের সৃষ্টি করিবে। কার্য্যত ইটালী তাহা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ইহাও ভোলা উচিত নয় যে বোম্বাই-এর কাছেই ভারতীয় নৌবহরের একটি

জাহাজ শত্রুর কার্য্যকলাপের ফলে মারা পড়িয়াছে। যদি ভারত সমুদ্রের উপকূল হইতে শত্রু বিতাড়িত হয় তাহা হইলে আমাদের দেশ সাক্ষাৎ আক্রমণ হইতে অনেক নিরাপদ বোধ করিতে পারিবে। শত্রু সুয়েজ খালের অপর পারে থাকিলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতে পারি।

দ্বিতীয়ত, আবিসিনিয়া তাহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইতে চলিয়াছে উহা আমাদের পক্ষে অতিশয় আনন্দের বিষয়। আবিসিনীয় সৈন্যেরা এখন আবিসিনিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে ইটালীর অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়াছে। অন্য দিকেও ব্রিটিশ সৈন্য আবিসিনিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহাদের সংকল্প। এই সংকল্প যদি কার্য্যে পরিণত হয়—এবং হইবে সন্দেহ নাই—তাহা হইলে একটা অতি বড় ঐতিহাসিক অবিচারের প্রতিকার হইবে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহার উদ্ভব হয় মাঞ্চুরিয়ায়, পরিণতি দেখা যায় আবিসিনিয়া ও স্পেনে। তখন গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইচ্ছা করিলে ইটালী ও জার্ম্মেনিকে অতি সহজেই প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিত। আংশিকভাবে আয়োজনের অভাবে ও আংশিকভাবে ইচ্ছার অভাবে তাহা করা হয় নাই বলিয়া আজ ফ্রান্সকে যে শাস্তি পাইতে হইয়াছে তাহা আবিসিনিয়ার দুরবস্থার সমতুল্য। শত্রুকে ঠেকাইবার জন্য গ্রেট ব্রিটেনকে যে চেষ্টা ও ত্যাগ করিতে হইয়াছে সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে তাহার এক-দশমাংশ ভোগ করিতে হইত না। যে রাষ্ট্রনীতি এই অবস্থার জন্য দায়ী তাহা যে ভুল উহা আজ সকলেই স্বীকার করিতেছেন।

পাঠরত সন্ন্যাসীযুগল
(এর্ণষ্ট্ বারলাখ্)

Engraved & Printed by Bharat Phototype Studio

ঈগল পাখী
(ফিলিপ হার্থ)

আধুনিক ভাস্কর্যে নূতন ধারা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

নূতন নূতন বস্তুর প্রকাশ লইয়াই জীবনের গতি। নূতন কখনও একেবারে নূতন রূপেই আবিষ্কৃত, এবং কখনও বা পুরাতনের মধ্য হইতে আবির্ভূত হয়। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া তখন আমরা মনে করি, বুঝি পুরাতনই আবার ফিরিয়া আসিল। কিন্তু জীবনের প্রকাশ কখনও পুনরাবৃত্ত হয় না। পুরাতনের সাজে আসিলেও, জীবনের প্রকাশ যুগধর্মের প্রভাব এড়াইতে পারে না, তাহার যথার্থ রূপ সম্পূর্ণভাবে নূতন রূপই হইয়া থাকে। যুগে যুগে নব নব কলেবর ধারণ করিয়া মানুষের চিন্তা ও চেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই চিন্তা ও চেষ্টা কখনও নূতন আবিষ্কারের আনন্দে মাতে, সাহসের সহিত সচেতনভাবে আগাইয়া যায়; আর কখনও বা পুরাতনকে আশ্রয় করিয়া একটু বিশ্রান্তি, আরাম ও শান্তি পাইতে চায়, একটু দম লইতে চায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহায়তায় যেখানে পুরাতনের সঙ্গে পরিচয় একেবারে লোপ পায় নাই, অথবা নূতন করিয়া এই পরিচয় ঘটে, সেখানেই এইভাবে পুরাতনকে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করিবার আগ্রহ হইয়া থাকে। কিন্তু এই দম লওয়ার মধ্যেও তাহার প্রাণধর্ম যদি অটুট থাকে, তাহা হইলে মানুষের চিন্তা ও চেষ্টা কেবল পুরাতনের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকিতে পারে না, পুরাতনের ধ্যান নূতন-ভাবেই মানুষের চিন্তা ও চেষ্টাকে অনুরঞ্জিত করে, তাহার অপরিহার্য আত্মপ্রকাশকে আবার নূতন রূপ দেয়। কিন্তু পুরাতনের মোহটুকু তাহাতে কিছু পরিমাণে লাগিয়া থাকে, এবং ইহাই একটা অপূর্ব অভিনবত্ব, একটা রমণীয়তা আনিয়া দেয়।

জীবনের অন্য সমস্ত প্রকাশের ন্যায় শিল্প সম্বন্ধে একথা বিশেষ করিয়া খাটে। যুগে যুগে মানুষ নূতন নূতন রূপ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সংঘবদ্ধ সভ্যজীবনের পথে যাত্রা আরম্ভ হইবার পরে প্রথম কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল কেবল অগ্রগতি। পুরাতন তখন ছিল সংখ্যায় বা প্রসারে অল্প, এবং মানুষ প্রথম প্রথম পুরাতনকে স্মরণ করিয়া রাখিবার অবকাশ পায় নাই। তারপরে যখন পূর্ণতর ও প্রৌঢ়তর সভ্যতার উদ্ভব হইল, যখন মানুষ অতীতকে স্মরণ করিয়া রাখিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার প্রয়াস করিল, তখন ধর্ম সাহিত্য প্রভৃতির ন্যায় শিল্পের ক্ষেত্রেও পুরাতন আপন প্রভাবজাল বিস্তার করিতে লাগিল। সভ্যতায় মানুষ যত এদিকে আসিতে লাগিল, যত তাহার পিছনে অতীতের ক্রিয়াকলাপ ও কৃতিত্ব পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল, ততই অতীতের আশ্রয় সময়ে সময়ে তাহার কাম্য বোধ হইতে

আরম্ভ করিল। প্রাচীন মিসরের শিল্পেতিহাসে এরূপ ঘটনা একাধিকবার হইয়া গিয়াছে। চীনদেশের শিল্পকথায়ও ইহা দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীসে ফেইদিয়াস্-এর পূর্বের যুগে যে আদিমগন্ধী শিল্পরীতি ছিল, তাহার চরম উন্নতির পরে রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে তাহা পতনোন্মুখ হেল্লেনিস্টিক শিল্পে পর্যবসিত হইল; তখন শিল্পের পথে নূতনের সন্ধান না পাইয়া গ্রীক ও রোমান ভাস্করদের কেহ কেহ আবার গ্রীসের আদিমগন্ধী শিল্পের চর্চা ও সাধনা এবং পুনরাবাহনের চেষ্টা করিলেন। তখন গ্রীক ও রোমান সমাজের আত্মিক অবনতির যুগ, তাহার প্রাণধর্ম পীড়িত, সৃজনীশক্তি ক্ষীণ, তাই দুই চারিজন কৃতী শিল্পীর হাতে অবলুপ্ত ঞ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকের গ্রীক শিল্পের ভাব ও ভঙ্গীর দ্বারা অনুপ্রাণিত রোমান যুগের 'নেও-আত্তিক' বা নব্য-আত্তিক রীতির শিল্পে ভাস্কর্য এক নবীন-মনোহর রূপে আত্মপ্রকাশ করিল বটে, কিন্তু প্রাচীনের আবাহন প্রাণহীন হইয়াই রহিল—'আর্কাইক' বা যথার্থ আদিযুগের শিল্পের অনুকরণ, গ্রীকো-রোমান যুগের 'আর্কাইস্টিক' বা অনুকৃত আদিমযুগের শিল্পের রূপ ধারণ করিয়া, রসাভাসের ব্যর্থতা প্রকাশ করিল মাত্র। ইহার পরে গ্রীকো-রোমান শিল্পের ইতিহাস হইতেছে ধীরে ধীরে বার্ধক্য ও মৃত্যুর ইতিহাস। তদনন্তর নূতনের আবিষ্কার হইল,—বাহিরের হাওয়া কপ্‌ট্ বা খ্রীষ্টান মিসর হইতে এবং সাসানীয় ইরান হইতে পূর্ব-ইউরোপের গ্রীক জগতে বহিল, বিজাতীয় শিল্পের উদ্ভব হইল। রোমান শিল্প ক্রমে 'রোমানেস্ক' শিল্পে, অর্থাৎ শুদ্ধ রোমান হইতে রোমান-ভাব-গ্রস্ত নবীন শিল্পধারায় রূপান্তরিত হইল; পরে এই রোমানেস্ক শিল্প উত্তর-ফ্রান্স-এর ও জরমানির ফরাসী ও জরমান শিল্পীদের নূতন সাধনার ফলে গথিক শিল্প নবীন পথ পাইল, নবজীবন লাভ করিয়া মধ্য যুগের ইউরোপের সভ্যতার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া উঠিল।

রেনেসাঁস বা পুনর্জাগৃতির যুগে পশ্চিম-ইউরোপের গ্রীক সাহিত্য ও গ্রীক শিল্পের সহিত নূতন করিয়া পরিচয় ঘটিল। ফরাসী, জরমান, ডচ, ইংরেজ, স্পেনীয় প্রভৃতি পশ্চিম-ইউরোপের আধুনিক জাতিগুলির গঠনের পূর্বে রোমানদের মারফৎ গ্রীক সাহিত্যের ও গ্রীক চিন্তার হাওয়া অল্পস্বল্প যেটুকু ইহাদের পূর্বপুরুষ রোমানদের দ্বারা বিজিত পশ্চিম-ইউরোপের গল, ব্রিটন, বেল্‌গী, গের্মানী, ইবেরীয় প্রভৃতি জাতির মধ্যে বহিত, তাহাকে গ্রীক জগতের সহিত পরিচয় বলা চলে না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে গ্রীসের ভাবজগৎ এবং রোমের মারফৎ গ্রীসের শিল্পজগৎ পশ্চিম-ইউরোপের আধুনিক জাতিগণের নিকট আবিষ্কৃত হইল। গথিক শিল্পে তখন ভাটা পড়িয়াছে। প্রাচীনের এই আবিষ্কার পশ্চিম-ইউরোপের ময়চৈতন্যের পক্ষে যেন সোনার কাঠির কাজ করিল। দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির

সংস্কৃতির সব দিকে নূতন জীবন দেখা দিল। এই পুনর্জাগৃতির ফলে ইউরোপের বিরাট্ রেনেসাঁস শিল্পের অভ্যুত্থান।

কিন্তু যে গ্রীস সাহিত্যে ও শিল্পে রেনেসাঁস যুগের ইউরোপের কাছে ধরা দিল, তাহা সত্যকার গ্রীস নয়—তাহা প্রাচীন গ্রীসের মুখস-পরা রেনেসাঁস-এর যুগের ইউরোপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। বাহিরের নামটা গ্রীসের, কিন্তু রূপ পর্যন্ত গ্রীসের ছিল না—বিশেষতঃ শিল্পে। গ্রীক সাহিত্য ও শিল্পের পতনের যুগের সৃষ্টিগুলিই তখন ইউরোপের মনকে মোহাবিষ্ট করে। প্লাতোন্ আরিস্তোতল-এর চিন্তা কতকটা ধরা পড়িলেও, সাহিত্যে ও শিল্পে হেল্লেনিস্টিক যুগের এবং গ্রীকো-রোমান যুগের চটকদার জিনিসগুলিই ইউরোপের নিকট গ্রহণীয় বোধ হইয়াছিল। ১৪৫০ হইতে ১৭৫০ পর্যন্ত যে গ্রীসের আরাধনা ইউরোপে চলিল, তাহা হইতেছে রোমান রঙে রাঙানো পতনের যুগের গ্রীস। ক্লাসিক্যাল বা শ্রেষ্ঠতার যুগের গৌরবময় গ্রীসকে, খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম চতুর্থ শতকের গ্রীসকে, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও উনবিংশ শতকের মধ্যে ইউরোপ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে, কেবল থেওক্রিতস্ ও রোমান কবি ওবিদ্‌কে লইয়া ইউরোপের চিত্ত আর খুশী থাকিতে পারিল না—আইস্‌খুলস্ (ইস্কাইলস্), সোফোক্লেস ও এউরিপিদেসকে আবিষ্কার করিল, লাওকোওন-এর মূর্তি লইয়া মাতামাতি করিল বটে, কিন্তু পার্থেনন্-কেও আবিষ্কার করিল। জে.উস্, আফ্রোদিতে, আর্তেমিস্, হের্মেস্ প্রভৃতি গ্রীক দেবতাদের আর যুপিতর বা জুপিটর, বেনুস্ বা ভীনাস্, দিয়ানা বা ডায়ানা, মের্কুরিউস বা মার্কারি প্রভৃতি লাটিন এবং আধুনিক ইউরোপীয় নামের মেঘে ঢাকিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি আর রহিল না। শিল্প জগতে বিশেষ করিয়া, এবং কতকটা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, ক্লাসিক্যাল বা শ্রেষ্ঠতম যুগের গ্রীসের পূজা ও তাহার অনুকরণ চলিল। তখন ইউরোপের শিল্পসৃষ্টির শক্তি কমিয়া আসিয়াছে—শিল্পীদের মধ্যে যাহারা অভিজাত রুচির, তাঁহারা কেবল ক্লাসিক্যাল গ্রীসেরই ধ্যান করিতেছেন—অন্য চিন্তার অন্য দৃষ্টির তাঁহাদের অবকাশ বা লক্ষ্য নাই। ইহার ফলে ইটালীতে কানোভা, ডেনমার্ক-এ টোর্‌ভাল্‌ড্‌সেন্ এবং ইংলাণ্ডে ফ্লাক্সমান্-এর মত প্রাচীনের অনুকারীদের উদ্ভব। ইহারাও কিন্তু গ্রীসের শিল্পের শেষের যুগের ভাস্কর্য লইয়াই মশগুল ছিলেন, প্রাচীনতর যুগের খবর ইহারা পান নাই। রেনেসাঁস, গ্রীকো-রোমান, ক্লাসিক্যাল গ্রীক—এই তিন শিল্পের ধারা প্রায় সমগ্র উনবিংশ শতক ধরিয়া ইউরোপের ভাস্কর্যকে জড়াইয়া রহিল—তাহার স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের পথে অন্তরায় হইয়া রহিল। বড় বড় ভাস্করেরা নূতন ধারার, নূতন ভাষার আবিষ্কারে চেষ্টিত হইলেন না; গ্রীক এবং গ্রীকের সঙ্গে

সংযুক্ত গ্রীকো-রোমান ও রেনেসাঁস জগৎ ভাস্কর্য বিষয়ে এমনিই উচ্চ স্থানে উঠিয়াছিল যে, তাহার অপেক্ষা উন্নততর আর কিছুর কল্পনা সহজে লোকের মনে আসিতে পারিল না—বিচারশীল কলা-বিদগ্ধ সমঝদার পণ্ডিত পর্যন্তও যেন গ্রীক জগতের বহির্ভূত আর কিছুকে আমল দিবার সাহস মনে আনিতে পারিলেন না। ব্রিটিশ মিউজিয়মের বিখ্যাত প্রাচ্যকলাবিৎ লরেন্স বিন্‌য়ন বলিয়াছেন যে এমন কি এই বিংশ শতকেও—যে শতকে ইউরোপ এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার গ্রীক-জগৎ-বহির্ভূত স্বতন্ত্র শিল্পকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, তখন—জনৈক বিখ্যাত ফরাসী শিল্পরসিক ও লেখক ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রীক ভাস্কর্যের সংগ্রহ দেখিতে আসিলে তাঁহাকে যখন অনুরোধ করা হইল যে তিনি একবার ঐ মিউজিয়মের চীনা ভাস্কর্যের ও অন্য চীনা শিল্পের সংগ্রহ দেখিয়া যাউন, তখন উক্ত শিল্পরসিক ভীত চকিত হইয়া বলিলেন—"না, না, আর কিছু আমি দেখিতে চাহি না, গ্রীকেরাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তার অধিক আর কিছুর দরকার নাই।"

কিন্তু ভাস্কর্যে গ্রীক-রোমান-রেনেসাঁস-এর গতানুগতিকতা আর চলিল না—"নিত্য তুমি খেল যাহা—নিত্য ভাল নহে তাহা"—শিল্পে নূতন খেলার দিকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দলের মনোভাব পরিবর্তিত হইল। আত্মপ্রকাশের নূতন পন্থার খোঁজ হইল। ইহার পূর্বে ভাস্কর্যের প্রয়োগ ছিল সীমাবদ্ধ—কেবল নামী বা ধনী লোকের স্মৃতি রক্ষার জন্য মূর্তি-শিল্পের আবশ্যকতা অনুভূত হইত, এবং স্মারক প্রধান মূর্তিটির অলঙ্করণ স্বরূপ তাহার পাদপীঠে নানা প্রকারের ভাব বা গুণব্যঞ্জক দেবদেবী অথবা পুরুষ বা রমণী-মূর্তি কল্পিত হইত। ইহাই ছিল ভাস্কর্যশিল্পের প্রকাশের প্রধান পথ। এ ছাড়া অল্পস্বল্প অন্য মূর্তিও রচিত হইত—ঐতিহাসিক দৃশ্য বা ঘটনা প্রভৃতির খোদিত চিত্রও গঠিত হইত। ফরাসী শিল্পী আঁতোয়ান লুই বারী (১৭৯৫-১৮৭৫) অদ্ভুত শক্তিমান গতিভঙ্গী প্রকট করিলেন তাঁহার কতকগুলি পশু-মূর্তি রচনায়—এগুলিতে একাধারে বিষয়-বস্তু এবং প্রকাশ-ভঙ্গী দুইয়েতেই নবীনত্ব আসিল। ফরাসী দেশে তারপরে আসিলেন ওগুস্ত রোদ্যাঁ (১৮৪০-১৯১৭)। ইহার হাতে আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্কর্য নূতন জগতে প্রবিষ্ট হইল। রেনেসাঁস এবং গ্রীকো-রোমান ভাস্কর্যের গতানুগতিকতা হইতে ইউরোপীয় ভাস্কর্যকে রোদ্যাঁ মুক্তি দিলেন। তাঁহার কৃতিত্ব হইল এই যে তিনি ভাস্কর্যে নূতন শক্তি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের সাহকম্প প্রকাশ—এই জিনিসগুলি অভূতপূর্ব রূপে আনিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে বিংশ শতকের প্রথম পাদের মধ্যে, রেনেসাঁস ও গ্রীক শিল্পকেই সর্বস্ব করিয়া লইয়াছিল যে ইউরোপ, তাহার চোখের পরদা খুলিয়া গেল—প্রাচীন

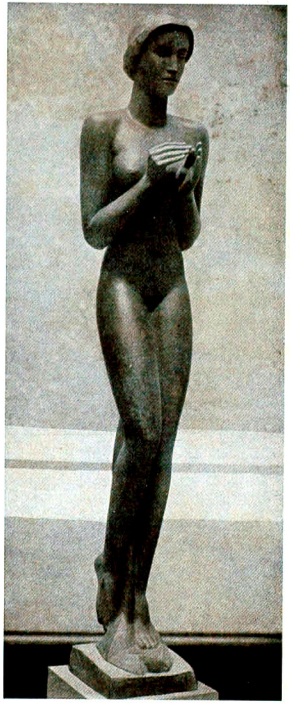

আস্থনটা (ব্রঞ্জ)
(গেয়র্গ কোল্‌বে)

মাতা ও শিশু
(ভিলহেল্‌ম লেহ্‌মব্রুক)

বল্লম-ধারী
(পল ম্যানশিপ)

Engraved & Printed by Bharat Phototype Studio

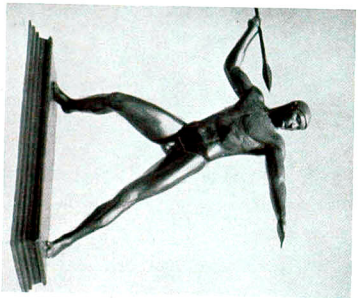

মিসরীয় ও আসিরীয় শিল্পের মধ্যে এবং গ্রীক শিল্পের প্রাথমিক বিকাশের মধ্যে সে রস আবিষ্কার করিল, ক্রমে জাপানী, চীনা ও ভারতীয় শিল্পের প্রাণও তাহার নিকট ধরা দিল, এবং ইউরোপ স্বয়ং খুঁজিয়া আফ্রিকার ও আমেরিকার আদিম শিল্পের সার্থকতা ও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য ধরিতে পারিল। গ্রীক ও রেনেসাঁস জগতের বাহিরের এই সব শিল্পধারা ইউরোপের শিল্পকে, বিশেষতঃ ভাস্কর্যকে—নানা ভাবে প্রভাবান্বিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সব নূতন জিনিস শিল্প-দর্শন বিষয়ে ইউরোপের চোখে নূতন দৃষ্টি দিল, হাতে নূতন শক্তি দিল ; তাহার দেশের প্রাচীন, অজ্ঞাত বা অবহেলিত কতকগুলি শিল্পধারা সম্বন্ধে আবার তাহাকে নূতন ভাবে সচেতন করিয়া দিল। যেমন বিজাতীয় ও গথিক ভাস্কর্য এবং প্রথম যুগের আর্কাইক্ বা খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতক পর্যন্ত কালের গ্রীক ভাস্কর্য। এখন ইউরোপের হাতে সর্ব-সংস্কৃতির সমন্বয় হইতেছে ; শিল্পে ভাস্কর্যেও— এখন এই সমন্বয়-কার্য বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান।

রোদ্যাঁর কৃতিতে রেনেসাঁস ও গ্রীকো-রোমান ভাস্কর্যের গতানুগতিক অনুকরণ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে রেনেসাঁস যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী মিকেল্-আঞ্জেলোর শক্তিশালী রচনার প্রভাব দেখা যায়। রোদ্যাঁর পরে ভাস্কর্য-শিল্প ফরাসী দেশের কতকগুলি ভাস্করের হাতে রোদ্যাঁ প্রবর্তিত নূতন রীতি অনুসৃত হয় ; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, যেমন বুর্দেল্, দেস্পিও ও ম্যাইয়ল, তাঁহারা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের পূর্ণপ্রকাশে চেষ্টিত হন—কোনও বিশেষ প্রাচীন বা নবীন রীতির অন্ধ অনুকারী ইঁহারা আর রহিলেন না। ভাস্কর্যে রোদ্যাঁর আবির্ভাবের পরে ইউরোপে সর্বত্র ও আমেরিকায় আবার পুনর্জাগরণ দেখা দেয় ; আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রেও ইহা সংক্রামিত হয়। ফ্রান্সের পরে জরমানি, ইংলাণ্ড, যুগোস্লাবিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ও আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রে কতকগুলি গুণী এবং নামী ভাস্কর দেখা দেন—ইঁহাদের হাতের কাজে, বিশেষ করিয়া বিগত মহাযুদ্ধের পরে, ভাস্কর্যে যুগান্তর আসিয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে ও মধ্য যুগে এক এক দেশে এক এক যুগে এক রকমের রচনাশৈলী শিল্পে— চিত্রে ও ভাস্কর্যে—উদ্ভূত হইত, এবং শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ কারিগর পর্যন্ত সমস্ত চিত্রশিল্পী বা মূর্তিশিল্প সেই এক এবং অদ্বিতীয় শিল্পশৈলী অনুসরণ করিত—জাতীয় ভাষা, জাতীয় ধর্ম, জাতীয় পরিচ্ছদ ও সভ্যতার অন্য বহিরঙ্গের মত প্রচলিত শিল্পধারার বাহিরে কেহই যাইতে পারিত না, যাইতে জানিত না, চাহিতও না। কিন্তু আধুনিক ইউরোপের পক্ষে সে কথা খাটে না। সমগ্র অতীত সভ্যতার—প্রাচীন ও মধ্য যুগের, ইউরোপের, এশিয়ার,

আফ্রিকার ও আমেরিকার, এমন কি ওশেনিয়ার, স্বদেশী বিদেশী সর্বপ্রকার শিল্প-চেষ্টাকে ইউরোপের চোখের সামনে এবং পসার দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সব দেশী বিদেশী প্রাচীন নবীন শিল্পরীতি, বিশেষতঃ ভাস্কর্য-শিল্প, ইউরোপের ওস্তাদদের মনের উপর ছাপ দিতেছে—আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা জাতির প্রাণ এবং তাঁহাদের নিজেদের যুগ ও নিজেদের ব্যক্তিত্ব এই সমস্তকে প্রকাশ করিবার আগ্রহ মনে মনে পোষণ করিতেছেন। ভাস্কর্য-শিল্প এখন ইউরোপে কেবল দোটানায় নহে, তেটানায় বা ঘূর্ণির টানে পড়িয়াছে। ১৮০০ বা ১৮৫০ সালে বিদগ্ধজনের অনুমোদিত শিক্ষিত উচ্চকোটির ভাস্কর্য সারা ইউরোপে ছিল এক প্রকারের—রেনেসাঁস ও গ্রীকো-রোমান আদর্শে অনুপ্রাণিত, বিষয়-বস্তু এবং রচনা-পদ্ধতি উভয় বিষয়েই সঙ্কীর্ণ। ১৯৪০ সালে এই একরাজা-পাশ সমগ্র ইউরোপের ভাস্কর্য-শিল্পকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। গ্রীক-রেনেসাঁস শিল্পের সর্বজন-পরিপাল্য একজাতীয়তা এখন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। কোনও একটি দেশে এখন আর 'প্যান্-ইউরোপীয়ান্' অর্থাৎ সর্ব-ইউরোপীয় অথবা 'ন্যাশন্যাল' অর্থাৎ জাতি-বিশেষ-নিষ্ঠ শিল্প আর বিদ্যমান নাই। একই দেশে এক জন ভাস্কর হয় তো এখনও রেনেসাঁস অথবা রেনেসাঁস-এর অন্তকালীন 'ব্যারক' রীতি আঁকড়াইয়া আছেন, এক জন ক্লাসিক্যাল বা শ্রেষ্ঠ গ্রীক ভাস্কর্যের ধ্রুপদ ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন। এক জন গথিকের মোহে পড়িয়া গিয়াছেন, এক জন হয় তো নূতন অনাগত শিল্পের ধারার আবাহনের জন্য অদ্ভুত কল্পনার অদ্ভুত কৌশলের, ক্বচিৎ আমাদের বোধগম্যতার বাহিরে অবস্থিত, নব নব রচনা করিয়া নিজেদের মানসিক অস্বস্তি প্রকট করিতেছেন; আবার কেহ বা পলিনেশীয় বা নিগ্রো জাতির আদিম ভাস্কর্যকে পরম পদার্থ, আত্মপ্রকাশের প্রকৃষ্টতম পথ বলিয়া স্থির করিয়া তদনুসারে ভাস্কর্য রচনা করিতেছেন। এই একই যুগে ইউরোপের বিভিন্ন বা একই দেশে এত অধিক বৈচিত্র্য ভাস্কর্যে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে যে তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ভাস্কর্যকে বাস্তবানুকারী না করিয়া কোথাও কোথাও তাহাকে অল্পবিস্তর আদর্শ-প্রকাশক করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে; কেহ ভাস্কর্যে বাস্তবকে নানাভাবে অতিক্রম করিতে চাহিতেছেন—প্রাচীন যুগের শিল্পে যেমন কোথাও নরদেহ অস্বাভাবিকরূপে দীর্ঘ করা হইত, সেরূপ কেহ কেহ করিতেছেন, কেহ বা সেই একই নরদেহকে অস্বাভাবিক-ভাবে স্থূল করিয়া রচনা করিতেছেন। আবার কেহ কেহ এই সমস্ত আতিশয্যের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতেছেন।

ভাস্কর্যে ইংলাণ্ডের খ্যাতি কোন কালে ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি এপষ্টাইন,

এরিক্ গিল্ প্রমুখ কতকগুলি আধুনিক ভাস্কর ইংলাণ্ডে এবিষয়ে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন। ফ্রান্স এ বিষয়ে নেতা ছিল; কিন্তু জরমানি, স্কাণ্ডিনেভিয়ার তিনটি দেশ (ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন) এবং যুগোস্লাবিয়ার কয়েক জন শিল্পী এখন ভাস্কর্যে লক্ষণীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইটালি শিল্প-নিকেতন, রেনেসাঁস-এর যুগে ইটালি ছিল ইউরোপের শিক্ষক; কিন্তু এখন ইটালিতে ভাস্কর্যে তেমন বড়দরের শিল্পী দেখা দেয় নাই—ইটালির আধুনিক শিল্পের মিউজিয়মগুলিতে এবং রোমের 'মুসোলিনি র‍্যায়ামশালা' (Foro Mussolini)তে যে-সব ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখিয়াছি, সেগুলি হইতে বিশেষ রস পাই নাই। ছবির সাহায্যে আধুনিক ইউরোপের প্রধান প্রধান শিল্পীদের কাজের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিবার পর, ইঁহাদের অনেকের স্বহস্ত-রচিত কৃতি দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। লণ্ডনের সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়ম ও পারিসের রোদ্যাঁ মিউজিয়মে রোদ্যাঁর হাতের কাজ; যুগোস্লাবিয়ার মেস্ত্রোভিচ্ ও রোসান্দিচ্-এর কাজ, ফ্রান্সের বুর্দেল, দেস্পিও, ম্যাইয়ল্ প্রভৃতির কাজ; এতদ্ভিন্ন জরমানির গেওর্গ কোল্‌বে, ক্লিম্‌শ প্রভৃতি শিল্পীর, এবং ডেনমার্ক-এর কাই নীল্‌সেন, নরওয়ের গুস্তাভ ভিগেলাণ্ড ও সুইডেন-এর কার্ল মিলেস্ এবং আমেরিকার পল মানশিপ প্রভৃতির অভিনব ও মনোহর মূর্তি রচনা দেখিয়া, আধুনিক জগতে ভাস্কর্য যে লোপ পায় নাই, বরঞ্চ নব নব পথে তাহার যাত্রা চলিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়—মানুষের শিল্প-চেষ্টা ভাস্কর্যকে অবলম্বন করিয়া এখনও যে সজীব রহিয়াছে, তাহা মনে হয়।

ভাস্কর্য মুখ্যতঃ মানুষকে লইয়া প্রকাশিত হয়—মানুষ, এবং অন্য প্রাণীর মূর্তি রচনাই হইল ভাস্কর্যের প্রধান কাজ। চিত্রবিদ্যার মত প্রাকৃতিক দৃশ্য ইহার এলাকার বাহিরে। এই জন্য মানুষকে যে ভালবাসে, ভাস্কর্য তাহার ভাল লাগা সহজ। জরমানি এখন 'টোটালিটারিয়ান্' অর্থাৎ সর্বগ্রাসী শাসনতন্ত্রের অধীন; জীবনের সব দিকেই জরমানির শাসকদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ পরিচালন চলিতেছে—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সব বিষয়েই শাসক সম্প্রদায়ের দিগ্‌গজদের স্থূলহস্তাবলেপ চলিতেছে—কিন্তু কেমন করিয়া জানি না, জরমানিতে মানবকেন্দ্রী এই ভাস্কর্য-শিল্প স্বাধীন ও স্ফূর্ত হইয়া রহিয়াছে। জরমানির বাস্তবরীতি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। বেলিন-এর 'রাইখস্‌পার্টেফেল্ড্' অর্থাৎ ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শনের রঙ্গভূমি ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য ইমারতগুলি যাঁহারা দেখিয়াছেন, যাঁহারা কোল্‌বে প্রমুখ ভাস্করদের রচনার সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলিবেন, জরমানির প্রাণ নাৎসি-মতবাদের চাপে পিষিয়া গিয়া বিনষ্ট হয়

নাই। গ্রীকেরা উদার ভাষায় তাহাদের সাহিত্যে, দর্শনে ও শিল্পে যে 'নরাশংস গাথা' বা মানব-বন্দনা-গীতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, আধুনিক জরমানিতে তাহাকে সাহিত্যে ও ফলিত বিজ্ঞানের প্রয়োগে এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় আজকাল বিকৃত ক্ষুণ্ণ বা সংকীর্ণ করিয়া দিলেও, ভাস্কর্যে তাহার হানি হয় নাই—সেখানে জরমান ভাস্করেরা আমাদের মহনীয় সঙ্গীত শুনাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

ইউরোপে এখন ভাস্কর্য শিল্পে নানা নূতন খেলা, নূতন আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। একটি বিশিষ্ট বা সর্বজনগৃহীত ধারা আর নাই। এই সমস্ত বিভিন্ন ধারাতে রচিত মূর্তি বিভিন্ন রুচির লোককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আকৃষ্ট করে, নিস্পৃহ করিয়া রাখে, অথবা বিদ্রোহী বা বিরোধী করিয়া তুলে। 'ফিউচারিস্‌টিক্' অর্থাৎ ভবিষ্যৎপন্থী, 'কিউবিস্‌টিক্' অর্থাৎ ঘনকাত্মক প্রভৃতি আধুনিক ধারা দেখিয়া অনেকে আত্মহারা হন, অনেকে আবার মারমুখা হন। নূতনের সাধনা বা আবাহন অনেকের কাছে কাম্য, অনেকের কাছে বর্জনীয়—পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। কিন্তু পুরাতনের মোহ বা পুরাতনের শিক্ষা আমাদের মনের সুপ্ত চৈতন্যের পক্ষে অনেক সময়ে সোনার কাঠির কাজ করে; এবং সত্যকার গুণী—প্রতিভাশালী শিল্পী—কেবল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারেন না, তাঁহার হাতে অভূতপূর্ব নূতন সৃজন হইবেই। তবে অনেকের হাতে স্বকীয় আদর্শ বা ব্যক্তিত্ব যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা হয় তো সকলের রোচক না হইতে পারে।

ভাস্কর্য শিল্পে আমার নিজের যাহা ভাল লাগে, তদনুসারে ইউরোপের আধুনিক ভাস্কর্যে যে একটি লক্ষণীয় ভঙ্গী কতকগুলি ভাস্করের হাতে আবির্ভূত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব। প্রথম যখন ভাস্কর্য সম্বন্ধে সচেতন হই, অর্বাচীন যুগের গ্রীক বা গ্রীকো-রোমান ভাস্কর্য আমাকে তখন বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সেটা ছিল বাহ্য সৌন্দর্যের প্রভাবের যুগ। পরে ইউরোপে গিয়া গ্রাক ক্লাসিক্যাল শিল্পের আকর্ষণ অনুভব করি, এবং লণ্ডন, প্যারিস, আথেন্স, ওলিম্পিয়া, বেলিন ও মিউনিক এর মিউজিয়মগুলি ঘুরিয়া নিজের শিল্পবোধ আস্তে আস্তে একটী জিনিসের আবিষ্কার করিয়া লয়—সেটী হইতেছে 'আর্কাইক্' বা আদি যুগের, ফেইদিয়াসের পূর্বের ও তাঁহার সময়ের গ্রীক শিল্প—ভাস্কর্যে, ও লাল বা সাদা জমীর উপরে কালরঙে আঁকা ঘটচিত্রে। গ্রীসের ওলিম্পিয়ার মিউজিয়মে রক্ষিত জে.উস্ দেবের বিরাট্ মন্দিরের ছাতের নীচে ত্রিকোণ ভূমিতে উৎকীর্ণ চিত্রে যেভাবে গ্রীক দেবতাদের ও পুরাণোক্ত

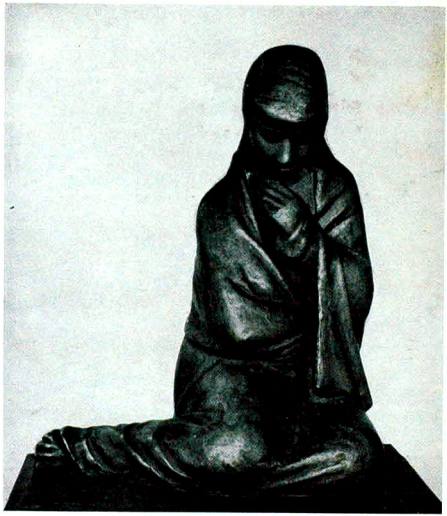

নিভৃত প্রশান্তি
(গেরহার্ট মার্ক্‌স্)

Engraved & Printed by Bharat Phototype Studio

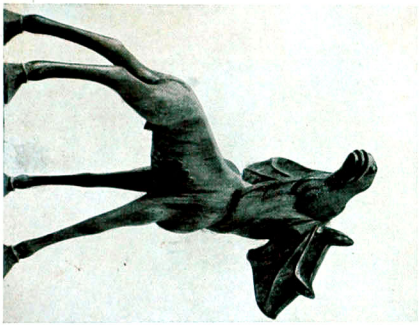

এল্‌ক্‌ শিশু
(কার্ল মিল্‌স্‌)

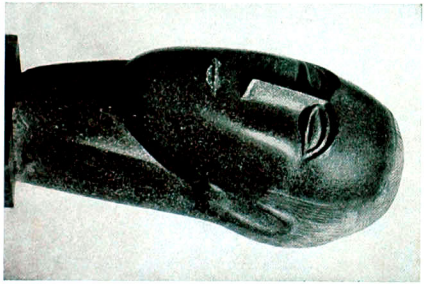

ডাইওরাইট নির্মিত নরমুণ্ড
(অসিপ্‌ জ্যাড্‌কিন)

পাত্রপাত্রীদের মূর্তি খোদিত আছে, তাহা দেখিয়া ও মিউনিকে রক্ষিত ঐ সময়ে গঠিত ঈজিনা দ্বীপের আফায়া দেবীর মন্দিরের অনুরূপ খোদিত চিত্রের মূর্তিগুলি, দেখিয়া খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধের প্রাক্-ক্লাসিকাল গ্রীক ভাস্কর্যের মহত্ত্ব ও গৌরব, তাহার অসীম শক্তি, তার দেবত্ব ও মানবত্বের মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য, তাহার অন্তর্নিহিত 'অদ্ভুত রস'—এ সমস্তের কথঞ্চিৎ প্রণিধান করিতে পারি। এই শিল্পে Reason ও Emotion-এর মধ্যে যে পূর্ণ সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা দেখা যায়, কেবল শিল্পের নহে, চিন্তার রাজ্যেও তাহা অতুলনীয়; জ্ঞান ও ভক্তির এরূপ সমন্বয়-সাধন, বাস্তবানুসারিতা ও লোকাতিগতার এরূপ মিলন, শিল্পের ইতিহাসে বেশীবার হয় নাই। শ্রেষ্ঠ গ্রীক ভাস্কর্য যতদিন এই সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, ততদিন তাহার শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ ছিল। পরবর্তী গ্রীক শিল্পে হেল্লেনিস্টিক ও গ্রীকো-রোমান যুগে, ও পরে রেনেসাঁস যুগে এই সামঞ্জস্য আর ফিরিয়া আসিল না; রেনেসাঁস যুগের ভাস্কর্যের জের চলিল ব্যারক ভাস্কর্যে, তাহাতে নাটকিয়া ঢঙ্‌ ছাড়া আর কিছুই মিলে না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে কানোভা ও টোর্‌ভাল্‌ড্‌সেন্‌ প্রমুখ শিল্পীরাও ইহা ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারেন নাই—তাঁহারা পুরাতনের প্রাণহীন অনুকরণ, প্রশংসনীয় নকল করিয়া গিয়াছেন। রোদ্যাঁ প্রমুখ যুগ-নেতারা অন্য পথে—নূতন পথে চলিয়া নূতন জিনিসের সন্ধানে বাহির হন। আর্কাইক গ্রীক শিল্পের সৌন্দর্য তখনও সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই।

আগেকার চেয়ে আরও গভীর ও আরও ব্যাপক ভাবে গ্রীক সাহিত্য শিল্পের সহিত পরিচয়ের ফলে, এই শিল্পের স্বরূপ এখন ধরা পড়িয়াছে—এবং বহু শিল্প-রসিককে ইহার বাণী এখন আকুল করিতেছে। ইউরোপের কতগুলি প্রতিভাশালী ভাস্কর এখন এই বাণীকে যুগোপযোগীভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। প্রাচীন গ্রীক শিল্পের বাণী—মানব-প্রতীকের সাহায্যে দেব-প্রকৃতিকে প্রকাশ করা—বাস্তবের মধ্যে আদর্শের জ্যোতি ফুটাইয়া তোলা—তাহার চেষ্টা ইহাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে। গ্রীক ব্যক্তি-বিশেষের চিত্রময় মূর্তিতে এই বাস্তবানু-কারিতার সহিত লোকাতিগতার সম্মিলন দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক ভাস্করের কৃতি আথেন্স-এর জননেতা পেরিক্লেস-এর বিখ্যাত মূর্তি, গ্রীক দিগ্বিজয়ী বীর আলেক্‌সান্দরের প্রতিমূর্তি, অথবা প্রাচীন গ্রীক কবি বা দার্শনিকদের মূর্তির সহিত বাস্তবানুসারী রোমান ভাস্করদের হাতের তৈয়ারী রোমান নরনারীদের প্রতিমূর্তির তুলনা করিয়া দেখিলেই এবিষয় প্রণিধান করা যাইবে। অংশতঃ ইহারা গ্রীক 'আর্কাইক' শিল্পের ভঙ্গী আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং তাহার আধারে

নূতন সৃষ্টির কাজে নামিয়াছেন। ইহাদের হাতে শিল্পের প্রধান উপজীব্য মানব-মানবীর দেহ আবার এক অদ্ভুত সুন্দররূপে দেখা দিয়াছে। মানুষের জয়গান বিশেষ করিয়া ভাস্কর্যেরই কাজ। এই জয়গানের সূত্রপাত করে গ্রীকেরা—কিন্তু প্রথমটায় তাহারা মানুষকে বিশ্বশক্তির অংশরূপেই দেখিয়াছিল—মানুষের মধ্যে তাহারা mystery বা অভেদ্য রহস্য পাইয়াছিল। রেনেসাঁস যুগে আরম্ভ হইল মানুষের দেহের পূজা—তাহাতে এই অভেদ্য রহস্য-টুকু নাই। রেনেসাঁস-এর ধারা এখনও অবলুপ্ত নয়—রেনেসাঁস আর গ্রীকো-রোমান ঢঙ টুকু বর্জন করিলেও, এখানকার বহু শিল্পীর কাজে সেই অভেদ্য রহস্যটুকু—সেই বাস্তবের মধ্যে লোকাতিগটুকু—পাওয়া যাইতেছে না। আমি নরওয়ের অস্লো নগরীতে অদ্ভুতকর্মা ভাস্কর ভিগেলাণ্ডের দ্বারা আরব্ধ ও সমাপ্তির পথে নীয়মান মানবজীবনের চিত্রণময় মানব-বন্দনাত্মক বিরাট বিশাল বহুল মূর্তিসমূহ দেখিয়াছি—কিন্তু তাঁহার মাংসবহুল মূর্তিগঠন প্রণালীতে একটা যেন খটকা লাগিয়াছিল—এখানে মানবদেহের জয়গান দেখিতেছি, বাস্তবিকতা দেখিতেছি, কিন্তু আদর্শবাদ ও রহস্যভাব তো মিলিতেছে না! যাঁহারা নিছক বাস্তবের উপাসক,তাঁহারা হয় তো প্রীত হইবেন—কিন্তু আমার কামা এই সমন্বয়, এই সামঞ্জস্য—বাস্তবের উপরে এই আদর্শের আলোকপাত।

কতকগুলি ফরাসী ও জরমান শিল্পীর কাজে এই জিনিসটি মিলিতেছে। ঋজু ও সুদৃঢ় দেহের তণিমায় গ্রীক ভাস্করেরা যে সমন্বয় আনিয়াছিলেন, তাহা ইহারা কতকটা ফিরিয়া পাইয়াছেন। একটা অনির্বচনীয় কিন্তু অনুভূতিগম্য শক্তি ও সাবল্য এবং তৎসঙ্গে একটা অদ্ভুত রস—যাহা অন্তর্নিহিত রহস্যভাবের অন্যতম লক্ষণ—তাহাও আসিয়া গিয়াছে। মাথার চুল, মুখ চোখের সমাবেশ, পেশীগুলির প্রকাশ, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অনুপাত প্রভৃতি বিষয়ে গ্রীক 'আর্কাইক্' শিল্পের এই ভঙ্গীটুকু প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক ভাস্কর্যে ইউরোপের বহির্ভূত বহু শিল্পের ধারার প্রভাব প্রত্যক্ষ, বা পরোক্ষ ভাবে আসিতেছে। ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রাম-শিল্পের ছায়াও কোথাও কোথাও পড়িয়াছে। কিন্তু এই শিল্পের মূল উৎস হইতেছে—গ্রীসের অবিনশ্বর ভাস্কর্য। সেই মূল এখনও নিজ মহিমায় কতকগুলি অবিনশ্বর মূর্তিকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে—এবং তাহা হইতে আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্কর্যের যে প্রশাখা নির্গত হইতেছে তাহাকে রসসিক্ত করিবার শক্তি এখনও তাহার আছে। Exotic বা বাহিরের জগৎ হইতে, বিশেষতঃ আফ্রিকা ওশেনিয়া ও আমেরিকার আদিম বর্বর বা অর্ধ-বর্বর জগৎ হইতে—আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্কর্য রস আহরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহা যেন পুরাপুরি তাহার ধাতুতে,

তাহার "ধর্ম"-তে সহিতেছে না। কিন্তু প্রাচীন 'আর্কাইক' গ্রীক শিল্পের ধারা—সে যেন গঙ্গাসাগর মুখে গঙ্গোত্রীর জল বহানো। ইউরোপের বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর যে এদিকে ঝোঁক পড়িয়াছে, এবং এই 'আর্কাইক্' গ্রীক শিল্পের ভাষায় বা তাহার অনুপ্রাণনায় যে তাঁহাদের দ্বারা সত্যকার নূতন সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা হইতে আধুনিক ভাস্কর্যেও ইহার উপযোগিতা ও সার্থকতা প্রমাণিত হয়। ভাস্কর্যে খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রীস একবার আদর্শ মানবমানবী মূর্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, বহুদিন পরে আবার আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্কর্য সেই ভাবের সৃজন কার্যে অবহিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত রুচি ও শিল্পবোধ হইতে আমার মনে হয়, আবার গ্রীসের প্রাচীন ভাস্কর্যের অনুপ্রাণনা এই কার্যে আধুনিক ভাস্কর্যকে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি দিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আমি মুখ্যতঃ প্রাচীন গ্রীক ও আধুনিক ইউরোপের ভাস্কর্যের কথা লইয়া বলিয়াছি। অন্য দেশে, বিশেষতঃ বিভিন্ন যুগে প্রাচীন ভারত ও বৃহত্তর ভারতে এবং চীনে ও জাপানে ভাস্কর্যের ধারা কি ভাবে চলিয়াছে, বিশ্বের ভাস্কর্যের ইতিহাসে গ্রীক ভাস্কর্যের ন্যায় ইহাদের স্থান কোথায়, সে আলোচনা একেবারে অবান্তর না হইলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু বলিয়া রাখি, বিজ্ঞানের মত শিল্পকলারও জাতি নাই—'প্রাচ্য শিল্প' ও 'পাশ্চাত্য শিল্প' বলিয়া পৃথক্ জাতির শিল্প নাই। নটরাজ মূর্তির অন্তর্নিহিত ভাব, তাহার আভ্যন্তর দার্শনিক চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছে, খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকের জে.উস্ বা আথেনা মূর্তির সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। চীনা বৌদ্ধ মূর্তির অন্তর্নিহিত ভক্তিভাব, খ্রীষ্টান গথিক মূর্তিতেও মিলে। শিল্প সম্বন্ধে এই কথাটা বড় কথা—Ars una, species mille "শিল্পকলা এক—তাহার রূপভেদ সহস্র।"

বাংলা গদ্যের কয়েকটি সমস্যা

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যকে যে রূপ দিয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। ভাষা, মুখের ভাষাই হোক বা সাহিত্যের ভাষাই হোক, কখনও স্থির হইয়া একই ভাবে থাকিতে পারে না, তাহার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা থাকে। যে ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হয় সে ভাষার আবার পরিবর্তন হয় খুব ধীরে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট রচনা, তাহার বারআনাই রবীন্দ্রযুগে। বিগত শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যলেখকের সংখ্যাও যেমন প্রচুর তাঁহাদের রচনাও তেমনি সারগর্ভ। বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, অনুরূপা, বলেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ, সুরেশচন্দ্র (সমাজপতি), রামেন্দ্রসুন্দর, রজনীকান্ত, ব্রহ্মবান্ধব, পাঁচকড়ি, অক্ষয়কুমার, রাখালদাস, অজিতকুমার, উপেন্দ্র কিশোর, দক্ষিণারঞ্জন, কেদারনাথ প্রমুখ বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী যুগের বিশিষ্ট গদ্যলেখক। ইঁহাদের রচনায় প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু ইঁহারা সকলেই বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়াই চলিয়াছেন। এই ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া বাংলা গদ্যরীতি যখন সুন্দর ও সুঠাম হইয়া চলিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন 'সবুজপত্রে'র নিশান উড়াইয়া 'বীরবল' পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। যিনি ছিলেন এতকাল সাধুভাষার রক্ষক ও প্রধান আশ্রয়, তিনি বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। নেতার দলত্যাগে সাধুভাষার লেখকগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন না, দু-এক জন দলপতির সঙ্গে নূতন দলে যোগ দিলেন, আবার নূতন দলে আরও কয়েকজন লেখক আসিয়া জুটিল এবং কথ্যভাষা ভাল না সাধুভাষা ভাল ইহা লইয়া আবার দুই দলে তুমুল তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইল। কথ্যভাষার দাবী বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এই নূতন নয়, বাংলা গদ্য যখন সূতিকাগৃহে তখনও এই প্রশ্ন একবার উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় তখনও হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতে আরম্ভ করিয়া উভয় রীতির দাবীই মানিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ব্যর্থ তর্কে যোগ দেন নাই। সংস্কৃত পণ্ডিতের টোলের ভাষা আর বাঙালী গৃহস্থের মুখের ভাষা, এই উভয় ভাষা মিশাইয়া একটি বিশিষ্ট রচনাশৈলী তিনি সৃষ্টি করিলেন এবং সেই ভাষায় এক বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া তাঁহার

প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র, স্তব্ধ ও শ্রদ্ধাবনত করিয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্যার সমাধান হইয়াছিল তাহাই আবার নূতনভাবে দেখা দিল যখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মধ্যগগনে।

ইহার ফল হইল এই, রবীন্দ্রনাথ এ পর্য্যন্ত তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে বাংলা গদ্যের যে শ্রী ও সমৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে সাধুভাষার মধ্যে যে গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী রচনায় তাহার আর উৎকর্ষ সাধন হইল না। বাংলা সাধুভাষা তাহার স্বাভাবিক পরিণতির ও বিকাশের পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে প্রতি দশ বৎসর পর পর বাংলা গদ্য রীতির যে উৎকর্ষ সাধিত হইতেছিল, গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর তাহা যেন থামিয়া পড়িল।

চলতি ভাষার লেখকগণের প্রধান বক্তব্য—লোকের মুখের কথায় ভাষার যে-রূপ তাহা আসল, আর সাধুভাষার যে রূপ, তাহা নকল। কথ্যভাষার শব্দগুলির মধ্যে প্রাণ আছে, গতি আছে, তাহারা সহজে চলিতে পারে, সাধুভাষার শব্দগুলির মত নির্জ্জীব গতিহীন নয়, তাহাদিগকে ঠেলিয়া চালাইতে হয় না।

লোকের মুখের ভাষায় এ পর্য্যন্ত বাংলাতে কোন সাহিত্য রচিত হইয়াছে কিনা সে আলোচনা এখন না করিয়া 'থিওরী' হিসাবে কথ্যভাষার গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। আমরা যে ভাষায় কথা বলি, সেই ভাষায় সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত এই যুক্তির প্রতিবাদে বলা যায়, আমরা প্রাত্যহিক জীবনে কয়টি কথা ব্যবহার করিয়া থাকি! দৈনন্দিন জীবনযাপনে, শোকে দুঃখে, উৎসবে আনন্দে, আলাপে আলোচনায় আমরা যে কথা ব্যবহার করি তাহা সাহিত্যের ভাব-প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রয়োজনের তাড়নায় সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ স্থানে আমাদের প্রত্যহের বিচরণ; আকারে ইঙ্গিতে ও আমাদের বহুব্যবহৃত পরিচিত কয়টি কথার সাহায্যে আমরা আমাদের কর্ম্মব্যস্ত জীবনের ভাবপ্রকাশ করিয়া থাকি। প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত কয়টি কথা লইয়া নানা বিচিত্র ভাবপরিপূর্ণ সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। সাহিত্যে শব্দের ব্যবহার কেবল অর্থ-নির্দ্দেশেই নিঃশেষ হয় না, অনেক ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা ভাষার সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। বক্তব্য বিষয়টি কেবল প্রকাশ করিলেই চলে না, সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। কেবল ভাবের সৌন্দর্য্য নয়, ভাষারও একটা সৌন্দর্য্য আছে—মানুষের মুখের ভাষায় সে সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না। সাহিত্যের ভাষা তাই কেবল ভাবের বাহন নয়, সে একটা শিল্পও। সেক্সপিয়র যে কয় সহস্র শব্দ তাঁহার রচনায় ব্যবহার করিয়াছিলেন সেগুলি সবই ইংরেজের 'গেরস্থালী ভাষা' নয়; মানবমনের বহু

বিচিত্র ও জটিল ভাব প্রকাশের জন্য অনেক শব্দ কবিকে বিদেশ হইতে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, অনেক অপ্রচলিত দুরূহ শব্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন—সেগুলি ইংরেজের মুখে মুখে তখন চলিত ছিল না। লোকের মুখের কথা লইয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কোনও দেশে রচিত হয় নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ চাহিয়াছিলেন সাধারণ লোকের মুখের কথা লইয়া কবিতা রচনা করিতে—কিন্তু তাঁহার ভাষা সরল হইলেও তাহা কাহারও মুখের ভাষা নয়। Poetic diction, poetic manner বর্জ্জন করিবার জন্য যেখানে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন, সেখানে প্রায়ই তাঁহার কবিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে আড়ষ্ট গদ্য। সাধারণের মধ্যে যাহা অসাধারণ, যাহা বিশিষ্ট তাহা খুঁজিয়া বাহির করাই কবির কাজ। লোকের মুখের কথার মধ্যে যে 'প্রাকৃত ভঙ্গিমাটি' থাকে তাহা অতিক্রম করিয়াই ভাষা সাহিত্যের ভাষায় রূপায়িত হয়। বাঙালী চিরকাল গদ্যেই কথা বলিত। কিন্তু গদ্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিতে এত সময় লাগিল কেন? যে সমস্ত দেশে কোনও গদ্যসাহিত্য নাই সে সকল দেশের লোকও গদ্যেই কথা বলে। সেখানেই বা গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির বাধা কেন? আমাদের মুখের কথা কৃত্রিম নয় বলিয়াই সজীব, প্রাণবান ও গতিশীল একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে এই সজীবতা চাঞ্চল্যের নামান্তর। এই চঞ্চলতা আসিয়াছে আমাদের ব্যস্ত কর্ম্মজীবনের সহস্র বিক্ষোভ হইতে। এই চাঞ্চল্যের সহিত আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির, আমাদের মানস জীবনের কোন যোগ নাই। ইহা 'উপরি-চর' ধর্ম্ম মাত্র। আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি যখন নানাভাবের সংঘর্ষে আত্মপ্রকাশের জন্য আকুলিবিকুলি করিতে থাকে, তখন কথ্যভাষার সাহায্যে আমরা ভাব প্রকাশ করিতে পারি কি? কোনও বৃহৎ কল্পনা, কোনও বৃহৎ ভাবপ্রকাশের জন্য প্রয়োজন অন্তর-মথিত-করা নির্ব্বাচিত পরিপূর্ণ বাক্। সাধারণের কলকাকলিতে অসাধারণকে প্রকাশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চলতি ভাষা সরল বলিয়া সকলেই সেই ভাষায় বুঝিতে পারে কিন্তু কেবল বুঝাইতে পারাই সাহিত্যের গুণ নয়। ব্যালাড্ অনেকটা চলতি ভাষায় রচিত হয়; কিন্তু ব্যালাড্ সাহিত্যের খুব উচ্চ আদর্শ নয়।

সাধুভাষা ভাল না চলতি ভাষা ভাল ইহা লইয়া বিশুদ্ধ তর্ক আমাদের দেশে অনেক হইয়াছে। কিন্তু মীমাংসা এখনও কিছু হয় নাই এবং বোধহয় কোনও দিনই হইবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দুই দলের পার্থক্য কোথায়? চলতি ভাষা যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহারা ক্রিয়াপদের কয়েকটি রূপের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কয়েকটি সর্ব্বনাম পদও একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু কথ্যভাষার যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা

তাহা সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই; চলতি ভাষার শব্দের রূপের কোনও নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বজনগ্রাহ্য নিয়ম নাই। সর্ব্বত্রই অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা। আশা করা গিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানসংস্কার সমিতি এই সম্বন্ধে একটা ফতোয়া দিবেন, কিন্তু তাঁহারা এই সমস্ত তুচ্ছ বিষয়ে মনোনিবেশ না করিয়া একেবারে ভাষার বনিয়াদ ধরিয়া নাড়া দিয়াছেন।

সাধুভাষা কৃত্রিম আর সাহিত্যে ব্যবহৃত কথাভাষা স্বাভাবিক—একথা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়া যায় না। সাহিত্যে যে কথাভাষা ব্যবহৃত হইতেছে তাহা সাধুভাষার মতই কৃত্রিম। 'শেষের কবিতা'র ভাষা বাংলার কোন জেলারই চলতি ভাষা নয়। এ ভাষার জন্মস্থান রবীন্দ্রনাথের মন। সাধুভাষা অপেক্ষা এই ভাষা অনেক কঠিন। কথ্যভাষার দাবী এ যুগে যিনি সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত করিয়াছেন সেই বীরবলের ভাষাও কাহারও মুখের ভাষা নয়। বীরবলের ভাষা বীরবলের মস্তিষ্ক হইতে জন্মলাভ করিয়া অনেক 'পাক ও মোচড়' খাইয়া কলমের ডগায় নামিয়া আসিয়াছে। তবে বীরবলের ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা যায় না, উহা একটা ভঙ্গী মাত্র। বীরবলের সরস পরিহাসনিপুণতা ও পাণ্ডিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে লিখিবার একটি নিজস্ব 'ষ্টাইল' বা রীতি। এই রীতির প্রধান দুর্ব্বলতা—সরসতা, মনস্বিতা প্রভৃতি অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও—ইহাতে Seriousness বা গাম্ভীর্য্য নাই। হয়ত বা এই রীতিতে গম্ভীর হইয়া কোন কথাই বলা চলে না। লেখক গম্ভীর হইয়া কোনও কথা বলিলেও পাঠক মনে করে বীরবল বুঝি রসিকতাই করিতেছেন। এই রীতিতে লিখিয়া ঠাট্টা করা চলে, রসিকতা করা চলে, তর্ক করা চলে—রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা চলে, ইহা মানুষকে হাসায়, কাঁদায়, রাগায় কিন্তু মাতাইতে পারে না। ইহা বুদ্ধিজীবীর ভাষা, বুদ্ধিমান পাঠককে বিস্মিত করে কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। বীরবলের রীতি যাঁহারা অনুকরণ করিয়া প্রবন্ধ বা সমালোচনা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভাষার দিক দিয়া তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। বীরবলের রীতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল রবীন্দ্রনাথের আধুনিক লিখিবার ভঙ্গী সম্বন্ধেও তাহা খাটে। 'শেষের কবিতা'র ভাষা বা তাঁহার উদ্ভাবিত অমিল ছন্দিত গদ্য আমাদের নিকট আনন্দের সামগ্রী হইয়াই থাকিবে—ইহার ব্যর্থ অনুকরণ হয়ত অনেকদিন চলিবে। প্রত্যেকটি শব্দের ও শব্দ-সমবায়ের রসাত্মার সন্ধান লাভ করা ব্যতীত এই রীতির এমন কোনও সহজ 'টেকনিক' নাই যাহাতে ইচ্ছা করিলেই যে কেহ এই রীতিতে সফলতা লাভ করিতে পারেন।

একটি কথা বলিয়া সংস্কৃত শব্দ ও সহজ গ্রাম্য শব্দের গুণাগুণ এবং সাহিত্যে

তাহাদের যথাযোগ্য স্থান সম্বন্ধে মন্তব্য শেষ করিব। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলি মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) তৎসম (সংস্কৃত)
(২) তদ্‌ভব (সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন)
(৩) দেশী (বাঙ্‌লা দেশে প্রচলিত অনার্য্য শব্দ)
(৪) বিদেশী (ফারসী, আরবী, ইংরেজী শব্দ)

সংস্কৃত শব্দগুলি অধিকাংশই স্বরান্ত বলিয়া উচ্চারণ করিতে একটু সময় লাগে, অনেকগুলি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হইলে পরস্পরের মধ্যে একটা ফাঁক বা অবকাশ থাকে, উচ্চারণ করিবার সময় এই ফাঁকগুলি সুরে বা তালে ভরিয়া উঠে। কিন্তু তদ্‌ভব ও দেশী শব্দগুলি প্রায়ই হসন্ত বলিয়া অনেকগুলি শব্দ পাশাপাশি বসিলেও কোনও অবকাশ না দিয়া ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া চলে। রবীন্দ্রনাথের "সন্ধ্যা রাগরক্তসম তন্দ্রা তলে"-র সহিত "দখিন্ হাওয়া, দোদুল্ দোলায় দাও দুলিয়ে" অথবা সত্যেন্দ্রনাথের "সিন্ধুর টিপ্ সিংহল্ দ্বীপ কাঞ্চন্‌ময় দেশ." তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। সংস্কৃত শব্দের গতি মন্থর, আর খাঁটি বাংলা শব্দের গতি দ্রুত দেখিতে পাই। যেখানে গল্প বলাই আবশ্যক, সেখানে তাঁহাদের ভাষা সহজ ব্যঞ্জনাস্ত বাংলা শব্দগুলি লইয়া দ্রুততালে ঝরণার মত ছুটিয়া চলিয়াছে। যেখানে কোনও কিছুর বিবরণ দেওয়া দরকার সেইখানেই এই স্টাইল। বাংলার কৃত্তিবাস, কাশীরাম এই স্টাইলের কবি। আখ্যান প্রবাহ যখন ছুটিয়াছে তখন তাহা কোথাও থামে নাই—ছোট ছোট ব্যঞ্জনান্ত শব্দের ঢেউ তুলিয়া অধীর গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। বোধহয় ইংরেজী সাহিত্যের চসারও এই জাতীয় কবি। কৃত্তিবাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, বিদ্যাসাগর হইতে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত পদ্যে গদ্যে সর্ব্বত্রই আমরা ইহাই লক্ষ্য করি, যেখানে কোনও গল্প তাড়াতাড়ি বলিতে হইবে, যেখানে কোন বিবরণ দিতে হইবে, যেখানে লেখকের বিশ্রাম করিবার, দাঁড়াইবার অবকাশ নাই, সেখানে ভাষা সরল, অধিকাংশ শব্দই তদ্‌ভব বা দেশজ। কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য যেখানে কেবল বলা নয়, ভাল করিয়া বলা, যেখানে তাঁহার কোনও তাড়া নাই, দাঁড়াইয়া ও থামিয়া, সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সকল দিক ঘুরিয়া যখন তিনি ধীরে ধীরে বলিতে চান, যেখানে লেখক কেবল গল্প বলিয়া বা বিবরণ দিয়া তৃপ্ত হন না, বর্ণনা দ্বারা ছবি ফুটাইয়া তুলিতে চান, সেখানে ভাষা পুষ্পিত, অলঙ্কারবহুল—শব্দগুলিও অধিকাংশ তৎসম শব্দ। মধুসূদন এই জাতীয় লেখক।

চসারের সঙ্গে মিল্‌টনের যে প্রভেদ কৃত্তিবাস ও কাশীরামের সঙ্গে মধুসূদনেরও সেই প্রভেদ। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—ইহাদের প্রত্যেকের রচনা অনুসন্ধান

করিলে দেখা যাইবে, যেখানে আখ্যান সেখানে ভাষা সরল, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য সেখানে নাই; কিন্তু যেখানে বর্ণনা, রচনা যেখানে চিত্রধর্ম্মী সেখানে তদ্‌ভব বা দেশজ শব্দের সংখ্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। কথ্যভাষার রীতিতে অল্পাক্ষর বাংলা শব্দ ব্যবহার করিয়া যে রচনা করা হয় তাহা সরস, সবল ও স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু রচনাকে উন্নত ও ভাবসমৃদ্ধ করিতে হইলে সেই সমস্ত শব্দের প্রয়োজন—সাহিত্য জগতে যাহাদের আভিজাত্য প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

বাংলা গদ্যে কথ্যভাষারও স্থান আছে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের পরিপূর্ণতা ও সমৃদ্ধির দিক হইতে উভয় রীতিরই প্রয়োজনীয়তা আছে। বাংলা গদ্যসাহিত্যে কেবল বৃহৎ ভাব, বৃহৎ কল্পনাই স্থান পাইবে এমন নয়; সাধারণ আটপৌরে ভাবপ্রকাশের জন্য হাল্‌কা রীতির প্রয়োজন। 'বলাকা'র ভাষায় যেমন 'ক্ষণিকা' লিখিলে মানাইত না, 'গান্ধারীর আবেদনে'র ভাষায় যেমন 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' লেখা চলে না, তেমনি 'কপালকুণ্ডলা'র ভাষায় "শেষের কবিতা" লিখিলে অশোভন হইত। রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলিতে যে সৌষ্ঠবপূর্ণ 'পুষ্পিত অলঙ্কারাঢ্য' রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, এখন তিনি সে রীতিতে কেন লিখিতেছেন না বলিয়া আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। বর্ত্তমান সময়ে তিনি যাহা রচনা করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বের রীতিতে লিখিলে অশোভনই হইত।

বাংলা গদ্যে চল্‌তি ভাষা ও সাধুভাষার বিরোধ প্রধান সমস্যা নয়। বাংলা গদ্যের প্রধান সমস্যা দেখা দিয়াছে আর কয়েকটি বিষয়ে। ভাগীরথী তীরের কথ্যভাষার কাঠামোর উপর সাহিত্যের কথ্যভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে দেখিয়া পূর্ব্ববঙ্গের কথ্যভাষায় কেন সাহিত্য রচিত হইবে না এই যুক্তিতে কয়েকজন উৎসাহী লেখক পূর্ব্ববঙ্গের ক্রিয়াপদের রূপ লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাহির হইতে দেখিতে ইহা কোন সমস্যা বলিয়া বোধ হয় না। জোর করিয়া ভাষার রীতি গড়িয়া তোলা যায় না। কিন্তু ইহা উপলক্ষ্য করিয়া অন্ততঃ কয়েকজন উদীয়মান লেখকের মনে যে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধ দেখা দিয়াছে, তাহা যদি সংক্রামক হইয়া পড়ে, তবে বাস্তবিকই দুশ্চিন্তার কথা। বাংলা গদ্য রীতি ইহাতে পরিবর্ত্তিত হইবে না সত্য, কিন্তু যে সমস্ত লেখক অন্যভাবে সাহিত্য সমৃদ্ধ করিতে পারিতেন তাঁহাদের সেবা হইতে সাহিত্য বঞ্চিত হইবে। আমাদের সাহিত্যের যে চল্‌তি রীতি তাহা কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চশ্রেণীর কথ্যভাষাকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখন আর তাহা কলিকাতা অঞ্চলেরই কথ্যভাষা নয়, তাহা সমগ্র বঙ্গের শিক্ষিত ভদ্রলোকের কথ্যভাষা।

এক শতাব্দীর চেষ্টায় যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, সহজ সরল ভাবপ্রকাশের জন্য যে আটপৌরে রীতি আমরা পাইয়াছি, তাহা অস্বীকার করা, মূঢ়তা সন্দেহ নাই।

শুধু বাংলা গদ্যরীতি নয়, বাংলা ভাষা আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে —তাহা বাংলায় ফারসী ও আরবী শব্দের প্রচলন লইয়া। বর্ত্তমান সময়ে বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলমান লেখকগণের সংখ্যা আর নগণ্য নয়, তাঁহাদের রচিত সাহিত্যও অকিঞ্চিৎকর নয়। সুতরাং কেহ কেহ দাবী করিতেছেন ফারসী, আরবী শব্দকে বাংলা ভাষায় প্রবেশের অধিকার দিতে হইবে। বাংলা ভাষা কেবল হিন্দুর ভাষা নয়, মুসলমানেরও ভাষা, এবং জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানের সংখ্যা যখন অধিক তখন আরবী ফারসী শব্দগুলিকে বাংলা ভাষা হইতে বহিষ্কার করা নিতান্ত অসঙ্গত। এ সমস্যাও গুরুতর নয়, কিন্তু আমাদের দেশে ইহাও গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। বহু পূর্ব্ব হইতেই যখন বাংলায় এক জন মুসলমান লেখকেরও আবির্ভাব হয় নাই, তখনই বাংলা ভাষায় প্রায় দুই হাজার মুসলমানী শব্দের প্রচলন ছিল। এই শব্দগুলি নিজের জোরেই বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং এতদিন পর্য্যন্ত নিজের জোরেই টিকিয়া আছে। ফারসী শব্দ প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করিতে কোনও বাঙালী লেখক কোন দিন দ্বিধা বোধ করেন নাই। কতকগুলি শব্দ যে মূলত ফারসী ও তুরকী তাহা আমরা এখন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। "জমি", "জমা", "সহর", "সরম", "গরম", "নরম", "বরফ", "মোজা" ইত্যাদি শব্দ যে বিদেশী তাহা চিনিবার আজ কোন উপায় নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীতে সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল তাঁহাদের কবিতায় প্রচুর পরিমাণে ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন. মুসলমানী পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইলে ফারসী শব্দ ব্যবহার করা দরকার এই প্রয়োজনবোধেই তাঁহারা বিদেশী শব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নজরুল ইস্‌লাম তাঁহার কবিতায় অনেক ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার "দারিদ্র্য" শীর্ষক কবিতায় আমরা কি দেখি? এই কবিতার প্রথম ২১ লাইনে ১১১টি শব্দ আছে, ইহার মধ্যে ৬৭টি শব্দ বিশুদ্ধ সংস্কৃত আর অবশিষ্ট ৪৪টি সংস্কৃতজ। বিদেশী ও দেশজ শব্দ একটিও নাই। প্রত্যেক শব্দেরই যেমন একটা বাহিরের মূর্ত্তি আছে, তেমনি একটি অন্তরের মূর্ত্তিও আছে। শব্দের এই রসমূর্ত্তি যে লেখকের কাছে ধরা পড়ে, তিনিই যথাস্থানে উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করিতে পারেন। শব্দের শক্তি, শব্দের ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার রহস্য যিনি জানেন না, তিনি শব্দশিল্পী নন, তিনি তাঁহার রচনায় অস্থানে অপপ্রয়োগ দ্বারা রচনাকে অনর্থক ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন। সর্ব্ববিধ বাংলা রচনায় ফারসী কথা পরিত্যজ্য একথাও যেমন অসার, আবার মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক বলিয়া যেখানে সেখানে

ফারসী শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাও তেমনি যুক্তিহীন। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, বাংলা ভাষা হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়, বাংলা ভাষা বাঙালীর। বাংলা ভাষার গঠনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার ধাতুগত একটা প্রকৃতি আছে, তাহার বিদেশী শব্দকে গ্রহণ করিবার, হজম করিবার শক্তিরও একটা সীমা আছে। নিপুণ শব্দশিল্পী বাংলা ভাষার মূল প্রকৃতিটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যথাস্থানে বিদেশী শব্দের প্রয়োগ করিতে পারিলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু রসসৃষ্টির প্রেরণায় অগ্রসর না হইয়া যদি কেহ বাংলা ভাষায় ফারসী শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই লেখনী ধারণ করেন, তবে ভাষার উপর বড়ই অত্যাচার করা হইবে। যথেচ্ছভাবে বিদেশী শব্দের ব্যবহার যদি সংক্রামক হইয়া পড়ে, তবে ভয় হয় বাংলার নিজস্ব রূপটি আমরা হারাইব। এ সমস্যার সমাধান হইবে শক্তিমান মুসলমান লেখকের দ্বারা—যিনি শব্দের যথার্থ শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাস্থানে উপযুক্ত ফারসী শব্দের ব্যবহারে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও গদ্য রীতিকে সবল করিয়া তুলিতে পারিবেন।

কিন্তু এহো বাহ্য। বাংলা গদ্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা অতিআধুনিক যুগে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে এক সঙ্গে বহুলোকের আবির্ভাব। ইঁহারা বাংলা গদ্যের রীতির মূল ধরিয়া এমন নাড়া দিয়াছেন, তাহাতে আশঙ্কা হয় বাংলা গদ্য রীতির অন্তিম সময় বুঝি আসন্ন হইয়া আসিতেছে। এই লেখকগণকে বিশেষ একটি গোষ্ঠিভুক্ত বলা যায় না। ইঁহাদের ভিতর তরুণ আছে, আবার 'তরুণায়িত বৃদ্ধ'ও আছেন। ইঁহারা কেহ ছাত্র, কেহ অধ্যাপক, কেহ সম্পাদক, কেহ কর্ম্মী, কেহ বেকার। ইঁহাদের রচিত রস-সাহিত্য—গদ্য, উপন্যাস ও কবিতা বাদ দিয়া শুধু যদি প্রবন্ধ ও সমালোচনার গদ্যভঙ্গী দেখা যায়, তবুও বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। ইঁহাদের রীতি সাধুভাষাও নয় আবার ইংরেজী বাক্যরীতির প্রভাবপুষ্ট রচনাও নয়— মাঝে মাঝে মনে হয় ইহা যেন বাংলাও নয়। ইঁহাদের ভাষার গহন বনে প্রবেশ করিলে পাঠককে "দিশেহারা" হইতে হয়। প্রথম দুই চার লাইন পড়িয়া হয়ত কিছু বুঝা গেল। তারপর আসিতে লাগিল শব্দ ও বাক্যাংশ—প্রচলিত, অপ্রচলিত, কল্পিত। অর্থকে 'ঘুলাইয়া' তুলিবার এমন ভাষা বাংলায় আর দেখা যায় নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা ইংরেজী জানিতেন না তাঁহাদের মুখে অভিযোগ শোনা যাইত, ইংরেজী না জানিলে বর্ত্তমান যুগের বাংলা বুঝা যায় না। বাংলা গদ্যের উপর যে ইংরেজী ভাষার শব্দবিন্যাস-এর প্রভাব আছে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু এই যে বাংলার আধুনিকতম গদ্যরীতি, ইহার উপর কোন্ ভাষার প্রভাব পড়িয়াছে? বোধহয় কোন একটি ভাষার প্রভাব লইয়া এই রীতি গড়িয়া উঠিতেছে না; ইহাতে

বোধ হয় বর্ত্তমান যুগের একাধিক বিদেশী ভাষার শিথিল রীতির প্রভাব আছে। এই সব লেখা পড়িলে মনে হয় লেখকের একটা কিছু বক্তব্য আছে, কিন্তু সেই বক্তব্য বিষয়টি বলিবার জন্য লেখক যতই চেষ্টা করিতেছেন, বিষয়টি ক্রমেই দুর্ব্বোধ্য, জটিল ও প্রহেলিকাময় হইয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় বলিবার বিশেষ কিছু নাই বা বলিবার বিষয় সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট অনুভূতি মাত্র আছে—ইহার ফলেই ভাষারীতির মধ্যে খানিকটা 'বুদ্ধির ব্যায়াম' ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

আধুনিক যুগের শক্তিমান গদ্য লেখকগণের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, নলিনীকান্ত গুপ্ত ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা তিন জনই শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কিন্তু শেষোক্ত লেখক কথ্যভাষার ভঙ্গীতে লিখিয়াছেন।

গদ্য রীতির উপর সাময়িক পত্রিকার যথেষ্ট প্রভাব আছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, শিল্প, সাহিত্য, খেলাধূলা সমস্ত বিষয়ই সাময়িক পত্রিকাতে আলোচিত হয় বলিয়া, সাময়িক পত্রিকাগুলি কেবল ভাষার গদ্যরীতি প্রভাবিত করে না, ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি, শ্রী, সম্ভাবনা ফুটাইয়া তুলিয়া ভাষাকে সমৃদ্ধও করে। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি জাতীয় জীবনকে সর্ব্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি এখনও অর্জ্জন করে নাই (খবরের কাগজের ভাষা অর্থে দেশী, বিদেশী সংবাদ বা বিবিধ বিবৃতির কথা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে না)। ইংরেজীর অনুবাদ যাহা কাগজে প্রত্যহ প্রকাশিত হয়, তাহার মত কদর্য্য বাংলা বর্ত্তমান যুগে আর কোনও স্থানে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলির ভাষা শব্দচ্ছটাপূর্ণ ও একটু অতিরিক্ত আবেগময় হইলেও বাংলা গদ্যের রীতিটি এইখানে অক্ষুণ্ণ আছে। ইংরেজী বাক্যরীতির প্রভাবে ও উপযুক্ত শব্দ নির্ব্বাচনে ইহাতে জোর বা ওজঃশক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চিত্তবৃত্তির আবেগ হইতে এই ভাষার জন্ম—প্রত্যহ একটি করিয়া নূতন 'পরিস্থিতি'র সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের মানসিক উত্তাপকে বিশেষ একটা ডিগ্রীর নীচে নামিতে না দেওয়াই এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য। চিত্তবৃত্তির আবেগ হইতে এই ভাষার জন্ম, ইহাতে কোনও চিন্তানৈপুণ্য বা মনীষার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। সেইজন্যই এই 'স্টাইল' অনুকরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সভা সমিতিতে, বক্তৃতায়, বিবৃতিতে এই 'স্টাইল' ক্রমশ লেখকগণের আশ্রয় হইয়া উঠিতেছে। মনে হয় ভবিষ্যতে বাংলার সাধারণ লেখকগণের উপর এই সহজ, জোরালো ও আবেগময় গদ্যভঙ্গীর যথেষ্ট প্রভাব থাকিবে।

সভ্যতা *

ক্লাইভ বেল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সভ্যতা যাহা নয়

ব্যক্তিগত সম্পত্তির দাবি মানিয়া লওয়া সভ্য সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়। পশু সমাজ এরূপ দাবি স্বীকার করে না বটে; তাহাদের পাথরের অস্ত্রও নাই। বর্ব্বর মানব সমাজে এ দুইই আছে—ইহাতেই পশু হইতে তাহাদের পার্থক্য, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাই তাহাদের সভ্য করিয়া তোলে না। পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকার সভ্যতার সহায়ক হইতে পারে; কিন্তু এ দুইয়ের কোনটিকেই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অনেক বিত্তশালী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহার বিপরীত মত অবলম্বন করিয়া থাকিলেও ওয়েষ্টারমার্ক বলেন, বহু অসভ্য জাতির 'আমার' 'তোমার' সম্বন্ধে ভেদজ্ঞান যে কোনও ইংরাজ শাসকের ন্যায় সূক্ষ্ম। শ্বেতজাতির আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি প্রায় অপরিচিতই ছিল বলিয়া মনে হয়। তবে ন্যায়ের খাতিরে স্বীকার করিতেই হয় যে, এই শ্বেত সম্প্রদায় নিজেদের আমদানী করা নৈতিক অনাচারের প্রতিরোধে বিশেষ সচেষ্ট হইয়া তাহাদের কাছে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিল, যে অষ্টম আদেশ লঙ্ঘন যাহারা করে তাহাদের লভ্য অনন্ত প্রায়শ্চিত্ত। ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত যেন না করা হয়, ভগবান ও পরজন্মে বিশ্বাস সভ্য মানবেই সীমাবদ্ধ—আমাদের সভ্যতার ইহাই প্রাথমিক লক্ষণ নয়; পরন্তু, অধিকাংশ অসভ্য জাতিই ভগবানে বিশেষ আস্থাবান, এবং অনেক জাতি ভগবানকে খাইয়া পর্য্যন্ত ফেলে। অষ্ট্রেলিয়ার অনুন্নততম 'বুশমেনরা'ও—যাহারা বর্ব্বর সমাজেও বর্ব্বরতম—নীতিবোধের নিম্নস্তর ও বিচারক পরমপুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে; এমন কি তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে এবং বর্ষীয়ান ভদ্রলোকের মূর্ত্তিতে তাঁহার পূজা করে। বর্ব্বর জাতি কদাচিৎ নাস্তিক হয়; আমাদের মতই তাহারা 'বৃহত্তর আশা' পোষণ করে।

সাধারণ সভায় আমি ভদ্রমহিলাদের বলিতে শুনিয়াছি যে নারীজাতির প্রতি সম্মানই জাতির সভ্যতার মাপকাঠি; নারীজাতির উচ্চ নীচ অবস্থার উপরই সভ্যতার

* শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল অনূদিত

উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে। কিন্তু ব্যাপার তাহা নয়। ওয়েষ্টারমার্ক বলেন, বুশমেন, আন্দামান দ্বীপবাসী এবং ভেড্ডারা—যাহারা পশুদের নিকটতম—আরিস্টটলের সময়ের এথেন্সবাসীদের অপেক্ষা নারীদের অধিক মর্য্যাদা প্রদান করে। বহু বর্ব্বর জাতির নরখাদক পুরুষ বিশেষ স্নৈণ, এবং তাহারা স্ত্রীদের প্রায় সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করে। অথচ অতি সুসভ্য থাঙ্গ ও সুঙ্গ যুগে চীন দেশের পুরুষেরা স্ত্রীদের প্রায় গরুভেড়ার সমতুল্য মনে করিত। বহু নরখাদক জাতিতে অশেষবিধ সামাজিক সদ্‌গুণ বিদ্যমান, ইহা সুপ্রত্যক্ষ; তাহারা সহৃদয়, সাধু প্রকৃতির, পরিশ্রমী, স্বজাতির প্রতি মুক্তহস্ত, বিদেশীদের প্রতি অতিথিপরায়ণ। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইংলণ্ডের শ্রমিক সমাজের গুণাবলী সভ্য সমাজেই আবদ্ধ নহে। ভূপর্য্যটকেরা বহু সময়ে অসভ্য জাতির সত্যনিষ্ঠায় স্তম্ভিত হইয়াছেন। লঙ্কাদ্বীপের ভেড্ডারা সত্যপরায়ণতার আদর্শস্বরূপ; আন্দামানদ্বীপবাসী ও 'বুশমেন'রা মিথ্যাকে বিরাট পাপ বলিয়া বোধ করে। পক্ষান্তরে স্মরণ করা যাইতে পারে গ্রীক ও ক্রিটবাসীদের এ বিষয়ে বিশেষ সুনাম ছিল না; এবং য়ুরোপ ভূখণ্ডে গ্রেট ব্রিটেনের প্রতি যে বিশেষ অভিধা প্রযুক্ত হইয়া থাকে তাহা 'প্রবঞ্চক'। বহু অসভ্য জাতি শুধু সত্যনিষ্ঠই নয়, পরিচ্ছন্নও বটে। বর্ব্বর মনুবুট্টুর কুক্ষিগত গোল্ডকোস্ট নিবাসী 'মেগে' জাতি—প্রতিদিন তিন চার বার সর্ব্বাঙ্গ প্রক্ষালিত করিয়া স্নান করে। রোমান সাম্রাজ্যের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণ পর্য্যন্ত কয়জন য়ুরোপবাসী বৎসরে একবার করিয়াও সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়াছে ভাবিবার বিষয়।

যৌন নীতিবোধের ব্যাপারে বহু অনুন্নত জাতির আচার আমাদের হিংসার বস্তু। বস্‌ওয়েলের ন্যায় তাহারাও পরদারনিষ্ঠাকে ভীতির চক্ষে দেখে। ব্রেজিলের আরণ্য জাতিরা দৃঢ়ভাবে একনিষ্ঠ; ক্যালিফর্ণিয়ার অনেক জাতিও একদার। অধ্যাপক ওয়েষ্টারমার্ক যে ইহা সত্ত্বেও এইসব জাতিকে নীচ ও ক্ষুদ্র, পৃথিবীর অনুন্নততম জাতিসমূহের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন ভাবিলে দুঃখিত ও বিস্মিতও হইতে হয়। 'কার্ডকে'রা দলপতিকেও বহু বিবাহ করিতে দেয় না; মূল্যের বিনিময়ে অবশ্য যত খুশী ক্রীতদাসী সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু একাধিক নারীর সহিত সহবাস করিলে দলপতিকে দুর্নামভাজন হইতে হয়। এ যেন সভ্য সমাজে বিবাহিত লোকের পাচিকার পাণিপীড়ন। অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন, "ভেড্ডা ও আন্দামান দ্বীপবাসীদের মধ্যে এক বিবাহ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ য়ুরোপের যে কোনও দেশে প্রচলিত সামাজিক নীতির ন্যায়ই কঠোর।" তাঁহার উদ্দেশ্য কি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; তবে কর নিকোবর দ্বীপের অধিবাসীদের যৌন নীতি অনিন্দ্যনীয়।

এই শ্রদ্ধাভাজন বর্ব্বরদের "একটি মাত্র ভার্য্যা, এবং ইহারা যৌন অনাচারকে ভীষণ পাপ বলিয়া পরিগণিত করে।" ইহারা এবং অন্যান্য বহু অসভ্য জাতি এ পাপের জন্য দণ্ডবিধান করে নির্ব্বাসন বা মৃত্যু। ওয়েষ্টারমার্ক বলিতেছেন, "প্রণিধানের বিষয় যে লঙ্কাদ্বীপের ভেড্ডা, লুজোনের ইগোরোট এবং কতিপয় অষ্ট্রেলিয়ানিবাসী জাতির ন্যায় অতি বর্ব্বর জনসমাজ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ সেই শ্রেণীর যাহাদের যৌনজীবন সম্বন্ধে শুচিতাবোধ আছে)।" অধ্যাপক মহাশয় আরও বলিতে পারিতেন যে ইহাও কম লক্ষণীয় নয় যে হীনতম বর্ব্বরেরা স্বৈরাচারকে কদর্য্য পাপ বলিয়া মনে করিলেও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহনীয় যুগে ইহাকে সামান্য বিচ্যুতি বলিয়া দেখা হইয়াছে। কর নিকোবরের অধিবাসীদের আচরণের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে ইতিহাসের উজ্জ্বলতম যুগে বিশিষ্ট চিন্তাশক্তির ও সূক্ষ্ম অনুভবের অধিকারী জনসমূহ পরদারগমনজনিত পাপের বীভৎসতা সম্বন্ধে অন্ধই ছিল। প্লেটো নারীজাতি সর্ব্বভোগ্যা—এইরূপ মতবাদ প্রচার করিতেন। আল্‌কিবিয়াডিসের সুহৃদ্‌-চক্রে, হ্যাড্রিয়ানের রাজসভায়, মেদিচিদের প্রমোদ-উদ্যানে, বিশিষ্ট মহিলাদের যে সব প্রকোষ্ঠে বসিয়া ভোলতেয়র, হেলভেশিয়াস ও দিদেরো সুখচর্য্যার প্রচারকল্পে নূতন চিন্তাপ্রণালীকে রূপবন্ধ করেন—সর্ব্বত্রই একনিষ্ঠার মূল্য স্বল্পই ছিল। সোক্রাটিস ও সেক্‌স্‌পীয়র, রাফায়েল ও টিৎসিয়ান, সিজার ও নেপোলিয়ন, ডিউক অভ ওয়েলিংটন এমন কি জর্জ্জ এলিয়টও যে জীবন যাপন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা লুজোনের অভিজাত ইগোরোট সমাজে বাসের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। চীনের ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগেও ব্যাপার বড় ভাল ছিল না বলিয়াই আশঙ্কা হয়। অতএব কর নিকোবরের অধিবাসীরাও যখন যৌন অনাচারকে অতি গর্হিত পাপ বলিয়া মনে করে, তখন যৌন শুচিতা সভ্যতার অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ নয়, এই সিদ্ধান্ত আমাদিগকে অবশ্য গ্রহণ করিতেই হইবে।

দেশপ্রীতি বিশেষ করিয়া সভ্য সমাজেরই ভূষণ, ইহা মনে করিয়া আমরা যেন আত্মপ্রসাদ অনুভব না করি। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের দেশপ্রেম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এমন কি নাওডোওয়েসিদের সম্বন্ধে কাবভার এতদূর পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়াছেন যে, "স্বজাতির সম্মান, এবং উৎকর্ষ ইহাদের হৃদয়ের প্রবলতম অনুভূতি।" পশ্চিম আফ্রিকার ইওরুবাদের সম্বন্ধে ম্যাকগ্রেগর সাহেব বলেন, "ইহাদের তুল্য স্বদেশনিষ্ঠ জাতি আর নাই"; অথচ, আমার যদি ভুল না হইয়া থাকে এই জাতি খৃষ্টান প্রচারকদের ধরিয়া খাইয়া ফেলে, এইরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে। ফিজি দ্বীপ ও কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড যাইবার পথে ঘরমুখা সলোমন দ্বীপবাসীর দেহত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মিঃ উইলিয়ম্‌স্ একটি কাহিনীর উল্লেখ

করিয়াছেন। ফিজি দ্বীপের জনৈক অধিবাসী যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, দলপতির অনুরোধে তিনি আমেরিকা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার স্বদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবৃত করিতেছিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী চীৎকার করিতে থাকে "এই বাচাল অর্ব্বাচীনটাকে মারিয়া ফেল" এবং অবিলম্বে তাঁহার বাক্‌রোধ করে। সতীত্ব সম্বন্ধে যাহাই হউক, ফিজি দ্বীপে যে য়ুরোপের যে কোনও অঞ্চলের ন্যায় বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেম বর্ত্তমান, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। জগতের বর্ত্তমান জাতিসমূহের অবশ্য এ বিষয়ে শিক্ষণীয় বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু প্রাচীন যুগের বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতি ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারিলে লাভবান হইতে পারিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কনফ্যুশিয়াসের জীবদ্দশার অব্যবহিত পরেই চীনবাসীরা তাহাদের মনীষীদের নিকট শিক্ষালাভ করিতেছিল যে সমস্ত মানবকেই সমভাবে সমাদর করাই বিধেয়। হিন্দুজাতির পঞ্চতন্ত্রের মতে "এই লোকটি আপন এই লোকটি পর, এইরূপ চিন্তা লঘুচেতা ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে।" 'আবডেরা বাসী' ডেমক্রিটাস বলিতেন "বিজ্ঞের সব দেশেই প্রবেশের অধিকার। সমগ্র পৃথিবীই সজ্জনের স্বদেশ।" উত্তরকালের সিরেনেকরা ও সিনিক-মতবাদীরা দেশপ্রীতিকে উপহাস্য বলিয়া অবজ্ঞা করিত। ইহাদের মত হইতেই স্টোইকদের সেই উদার বিশ্বনাগরিকতা উদ্ভূত হইয়াছিল, যাহার উপাসক ছিলেন সেনেকা, এপিক্‌টেটাস ও মার্কাস অরেলিয়াস। যুদ্ধের প্রসঙ্গে ভোলতেয়র বলিয়াছেন, ইহা সুস্পষ্ট যে এক পক্ষের ক্ষতি না হইলে অপর পক্ষের লাভ সম্ভব নয় এবং বহু লোককে বেদনাক্লিষ্ট না করিয়া জয়ের উপায় নাই—ইহাই ভোলতেয়রের চরম সিদ্ধান্ত।

অতএব আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে যে সম্পত্তির দাবী স্বীকার কিম্বা স্পষ্টবাদিতা, পরিচ্ছন্নতা, বা ভগবান, পরলোক ও অনন্ত বিচারে বিশ্বাস, যৌন একনিষ্ঠতা এমন কি স্বদেশপ্রীতি কোনটিই সভ্যতার বিশেষ লক্ষণ নয়; যদিও ইহাদের প্রত্যেকটিই কল্যাণের বিশিষ্ট পন্থা। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে সভ্যতার প্রাণবস্তু এমন কিছু যাহা অসভ্য সমাজ এখনও লাভ করে নাই; সুতরাং আদিম সমাজসুলভ কোনও গুণাবলীই সভ্যতার আশ্রয় হইতে পারে না। বিগত দুই শতাব্দীতে মহাসুভব বর্ব্বর ও সভ্য মানবের যে বৈপরীত্য স্বীকৃত হইয়াছে তাহার মূলে সর্ব্বজনগৃহীত এই বোধ নিশ্চয়ই আছে যে সভ্যতা স্বতই উদ্ভূত হয় নাই। মানব সমাজ অতি সম্প্রতি যে দুইটি বৃত্তির বিকাশে সমর্থ হইয়াছে—তাহা আত্মসচেতনতা ও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি। সভ্যতা ইহাদেরই সহিত সংশ্লিষ্ট এইরূপ প্রত্যাশা করাই সঙ্গত। শিক্ষার ফল স্বরূপই আমরা

ইহাকে লাভ করিয়াছি, এইরূপ ভাবাই আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। সভ্যতা নিশ্চয়ই এমন কোনও বস্তু যাহা কৃত্রিম।

অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির অল্পবুদ্ধি বিজ্ঞানবিলাসজনিত দম্ভের ফলে আজও এমন মত প্রচলিত আছে বটে যে সভ্যতার উদ্দেশ্য পদার্থের নিয়মশৃঙ্খলায় নিঃশেষে আত্মসমর্পণ। ইহাদের অনুসৃত নীতি "প্রকৃতির হাতে সব ছাড়িয়া দাও।" পশু ও উদ্ভিদ্ জগতই সভ্যতার আদর্শস্বরূপ। ইহারা বলে, যোগ্যতমকে বাঁচিতে না দিয়া মানুষ গণ্ডগোল পাকাইয়াছে। যতদিন দুর্ব্বলকে নিশ্চিহ্ন হইতে দিয়া আমরা স্পষ্টই শক্তির জয় স্বীকার না করি ততদিন আমরা প্রকৃত সভ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিব না। বসুন্ধরা যোগ্যতমদেরই ভোগের জন্য। অবশ্য প্রশ্ন হইতেছে কাহারা যোগ্য? ক্ষীণকায় ব্যক্তিরা এমনভাবে সমাজ সংগঠনে সক্ষম হইয়াছেন যে লণ্ডনের বিরাটকায় পুলিসও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশীবহুল ছাত্রদের সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে। ইহার কারণ কি এই নয় যে যাহাদের দেহ ক্ষীণ তাহাদেরই মস্তিষ্ক সবল? জীববিজ্ঞানের পুঁথিতে যাহা বলে তাহাতে বিশ্বাস করিলে দেখা যায় যে জীবনের আবর্ত্তনে বুদ্ধির দান, অন্ততঃ দৈহিক শক্তির সমতুল্য। মানুষের ন্যায় নগণ্য শুণ্ডপায়ী জীবই ত বিশালকায় ম্যামথ অপেক্ষা জীবন সংগ্রামে সমধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে। মানুষের মধ্যেও, সম্ভবত যোগ্যতমই জয়ী হইয়াছে। ক্রমশ মনে হইতেছে প্রকৃতিবাদীর যুক্তি ব্যর্থ হইয়াছে। যোগ্যতমের নির্ব্বাচনই যদি প্রকৃতির নিয়ম হয়, তাহা হইলে যাহারা জয়ী তাহারাই যোগ্যতম এই সিদ্ধান্ত আমরা করিতে পারি। যুদ্ধ যদি কোনও দিন মানব জীবনের সাধারণ পরিবেশে পরিণত হয়—মনে হইতেছে হওয়া অসম্ভব নয়—তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকিবে সেই সব চতুর বলহীনেরাই যাহারা পরিবেষ্টনীর সঙ্গে নিজেদের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবে; যেমন তুষার যুগে সেই সব জীবই অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল যাহারা আবহের তীব্র আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে শিখিয়াছিল। বিজ্ঞানের ছাত্রেরা বলে, "তোমরা প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ।" আমাদের উত্তর, "আমাদের স্বধর্ম্মই যে তাই।" ভয় হয়, গোঁড়া জীববিজ্ঞানের কাছে এরূপ তর্ক হেঁয়ালি এবং মিথ্যা ঠেকিবে; এবং বৈজ্ঞানিক যেই বুঝিবেন, তিনি তর্কে পরাস্ত হইতেছেন, অমনি তিনি খুব সম্ভবত: নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। কাঁচা বৈজ্ঞানিকের ন্যায় উগ্র নীতিবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তি কমই আছে। যাহারা বিশ্বাস করে রুগ্ন শিশুদের বাহিরে ফেলিয়া রাখা, ক্ষয়রোগগ্রস্ত শিল্পীদের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা বা অধ্যাপক রে ল্যাঙ্কেস্টার দ্বারা আমাদের প্রণয়পাত্র নির্ব্বাচন করান,—কোনটিই আমাদের করা উচিত নয়,

অর্দ্ধশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক নৃশংস ভাষায় তাহাদের আক্রমণ করিয়া বলিবেন, ইহারা পান্‌সে, ফেরেপবাজ, জোচ্চোর, ভীতু, ছোটলোক, বোকা, প্যান্‌পেনে—একেবারেই জঘন্য। ইহারা ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করেন, "আমাদের করা উচিত"; কিন্তু এই ক্রোধ প্রকাশেও তাঁহারা নিজেদের আহাম্মকি প্রমাণ করেন না কি? জড় প্রকৃতিতে "উচিত" বলিয়া কিছু নাই; যাহা হইবার তাহাই হয়। প্রাণিবিদ্ যখন বলেন, প্রকৃতির বিরোধিতা আমাদের করা উচিত নয় তখন তিনি যে মাপকাঠি ব্যবহার করেন তাহা অপ্রাকৃত নীতিবোধের। প্রকৃতির নিয়মের সমর্থনে যদি নীতিবোধকে প্রয়োগ করা চলে, তাহা হইলে তর্কের খাতিরে প্রাকৃত নিয়মের বিপক্ষেও সেই নীতিবোধকেই আশ্রয় করা যাইতে পারে। আমরা বলিতে পারি যে শিশু বা রুগ্ন কবি বা যাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগ্যতার অনধিকারী তাহাদের বিনাশে আমাদের নীতিবোধ ক্ষুণ্ণ হয়। আমরা তর্ক করিতে পারি যে এরূপ কার্য্য আমাদের মতে মনের উন্নত অবস্থার পরিপোষক নহে। ভ্রূকুটি-কুটিল বিজ্ঞানের ছাত্র বলিবে, "বেশ, কিন্তু ঠিক জানিও প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মানুষ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।" আমরা ইহার উত্তরে বলিব, "যদি মানব জীবনের অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য ও পরিণতি বংশানুক্রমের সংরক্ষণ মাত্রই হয়, যদি এই উদ্দেশ্য সফল করা ভিন্ন ব্যক্তির আর কোনও মূল্যই না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেই বা ক্ষতি কি?" এখনও পৃথিবীতে বর্ত্তমান, এমন কোনও বানর সমাজের লোপে কিছুই যায় আসে না। যে উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য বানর সমাজের অস্তিত্ব, তাহা সাধন করাই যদি নর-সমাজের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে মানবের অস্তিত্বের কোনই প্রয়োজন থাকে না। যে মুহূর্ত্তে স্বীকার করা যাইবে যে বংশ রক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছুর জন্যই মানবের অস্তিত্ব, তৎক্ষণাৎ ইম্পিরিয়াল ইন্‌স্টিট্যুটের ভিৎ পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিবে; কারণ বংশ রক্ষা ভিন্ন অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যকে স্বীকার করি বলিয়াই আমরা দুর্ব্বলকে রক্ষা করি এবং ব্যক্তিকে সম্ভ্রম করি।

সাউথ কেন্‌সিংটনের বিজ্ঞানের ছাত্রদের উপকারকল্পে আমি যে দ্বিশৃঙ্গ তর্কপদ্ধতির শৃঙ্গযুগলকে মর্দ্দন করিতে সচেষ্ট, সে তর্ক এই যে, হয় যাহা আছে তাহাই ভাল, কিম্বা মানুষ প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নততর জ্ঞানলাভ করিয়াছে। যদি প্রথমটি সত্য হয়, আক্ষেপের কিছুই নাই; যদি দ্বিতীয়টিই সত্য হয়, আক্ষেপ করিবার উপযুক্ততর কারণ প্রাণিবিদ্‌কে আবিষ্কার করিতে হইবে। জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইয়া ম্যাস্টোডন পৃথিবী হইতে অবলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ম্যাস্টোডনের যে ব্রত ছিল, বংশ সংরক্ষণ—তাহা উদ্‌যাপিত করিতে অন্য একটি পশু তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সমগ্র প্রাণিজগৎ অব্যাহতই রহিয়াছে। সাউথ কেন্‌সিংটন

নিবাসী বৈজ্ঞানিককুল যদি নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং তাহার স্থানে যদি অন্য একটি প্রাণসংরক্ষণে যোগ্যতর জাতির উদ্ভব হয়, ক্ষতি কিসে? জীবজগতের তাহাতে ইতরবিশেষ হইবে না; প্রকৃতির উদ্দেশ্য ইহাতে সুসাধিতই হইবে। সাউথ কেনসিংটনস্থ বৈজ্ঞানিকদের রক্ষা করিতে কেনই বা আমরা হয়রাণ হইব যদি না বিশ্বাস করি যে ইহাদের উদ্দেশ্য প্রকৃতির উদ্দেশ্য হইতে স্বতন্ত্র এবং সূক্ষ্মতর। পাঠক হয়ত আপত্তি করিবেন, "মেজাজ খারাপের দোহাই দিয়া সরু কাটাই বা কেন? সভ্য সমাজ বলিতে বংশরক্ষায় তৎপর কোনও জীবকে বুঝায় না, এই কথা যে কোনও লোকের বোধগম্য করিতে দুইটি বাক্যই যথেষ্ট। পিপীলিকারাই বা কি দোষ করিল?"

হয়ত নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন যে আরও দুই একটি এমন বস্তু আছে যাহা সভ্যতা নয়। যেমন, যদিও অনেকে মনে করেন জটিল যন্ত্রসৃষ্টি সভ্যতার অঙ্গীভূত, আসলে তাহা নয়। যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে জার্ম্মানী ফ্রান্‌স্ অপেক্ষা সভ্য ছিল এমন কথা বলা শুধু নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নয়, দেশদ্রোহিতাও বটে। অথচ শিল্পের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগে এক যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন জাতি ছাড়া অন্য সমস্ত জাতিকে জার্ম্মাণী অতিক্রম করিয়াছিল। পেরিক্লিসের যুগে এথেন্‌সের ন্যায় আজিকার দিনের মেলবোর্ণ সুসভ্য এমন কথা কেহই ভাবে না; এবং নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে এই বিশালকায়, বিদ্যুতালোক-উদ্ভাসিত, বাষ্পযানসেবিত, ট্রামমুখর নগরীর বিদগ্ধতম নাগরিকেরা এমন ভুল কখনই করিবে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু ফরাসী স্বীকার করে যে আজিকার প্যারিস পেরিক্লীয় এথেন্‌স অপেক্ষা কম সভ্য। কিন্তু শুধু ফরাসীরাই নয়, শিক্ষিত মার্কিনমাত্রেই স্বীকার করিবে যে আধুনিক প্যারিস হ্যা ইয়র্ক অপেক্ষা সুসভ্য; যদিও অস্বীকার করা যায় না, যে কি মানুষের কি পণ্যের চলাচল বিষয়ে, স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিধিব্যবস্থায়, এবং নগরকে আলোকিত করিবার পদ্ধতিতে প্যারিস এখনও যুগানুবর্ত্তী হইতে পারে নাই।

রুশ-জাপান যুদ্ধের ঠিক পরেই আমি সোহো পল্লীর একটি ভোজনশালায় আহার করিতে যাইতাম। এইখানে জন বার অতি তরুণ বুদ্ধিবিলাসী সপ্তাহে এক দিন করিয়া জনৈক ইংরাজ সেনাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। যাঁহারা বহুদিন কর্ত্তব্যের খাতিরে বুদ্ধিহীনতাকে আশ্রয় করিবার ফলে তাঁহাদের বুদ্ধির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন এই কর্ম্মচারী মহোদয় চমৎকার অমায়িক স্বভাবসম্পন্ন তাঁহাদের অন্যতম। আমার মনে পড়িতেছে আমরা কথাপ্রসঙ্গে এই নিবন্ধের যাহা বিষয়বস্তু—সভ্যতা কি, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। তখন ফেবিয়ান মতবাদ খুব মাথা চাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এ বিষয়ে

নিঃসন্দেহ ছিলেন যে নিঃস্ব, রুগ্ন এবং বিকলচিত্তদের জন্য ব্যবস্থা না করিলে কোন সমাজকেই সভ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না (এই সম্মিলনীতে কয়েকজন মহিলাও উপস্থিত ছিলেন)। অপর কয়েকজনের মতে সভ্য সমাজে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরই ভোট থাকিবে। আরও কয়েকজন বলিলেন যে প্রকৃত সভ্যতার অধিকারী হইলে যে কোনও জাতি প্রত্যেক কবি ও শিল্পীর বার্ষিক পাঁচ শত পাউণ্ড আয়ের ব্যবস্থা করিবে এবং নগরে নগরে চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত করিবে। আরও অনেকে—কিন্তু থাক। ইঁহাদের কথা তখন যেমন চিত্তাকর্ষক ঠেকিয়াছিল, এখন আর তাহা না লাগিবারই কথা। সৈনিকপ্রবর যাহা বলিলেন তাহা এই। "সভ্যতা কাহাকে বলে বলিতে পারিব না কিন্তু কখন কোন সমাজকে সভ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় জানি। যাঁহারা এই সব ব্যাপার বোঝেন, তাঁহাদের কাছে শুনিয়াছি যে বহু শতাব্দী ধরিয়া জাপান অতি সুললিত শিল্প ও সুপরিসর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু য়ুরোপের প্রথম শ্রেণীর একটি শক্তিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবার পূর্ব্বে সংবাদপত্র আমাদের এ কাহিনী কখনও বলে নাই।" কথাটির শ্লেষ সুপ্রযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু এই বীরপুঙ্গব কখনই এমন মত পোষণ করিতেন না যে যুদ্ধে পারদর্শিতাই সভ্যতার পরিচয়।

যে বর্ব্বরেরা রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, তাহারা সভ্য, কিম্বা যে তাতারেরা সুঙ্গবংশকে নিপাতিত করিয়াছিল এবং মধ্য-এশিয়ায় মুসলমান সভ্যতাকে বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহারা পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন মতের বিরুদ্ধে তিনি যে কোনও কাপুরুষের ন্যায়ই সরব প্রতিবাদ করিতেন, এ কথা আমি জানি। দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াই আমি তাঁহাকে বুঝাইতে পারিতাম। বিশ্বহিতৈষীদের সম্মুখে এইসব দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিতে হয়। যাঁহারা যন্ত্রের বিবর্ত্তনের সাহায্যে সভ্যতার পরিমাপ করেন তাঁহারা এইরূপ দৃষ্টান্তে বিভ্রান্ত বোধ করেন। না করিলেও তাঁহাদের বিপর্য্যস্ত বোধ করা উচিত। যে ব্যক্তি বলেন যে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোট থাকিলেই সে সমাজ সভ্য হইয়া উঠিবে, তিনি পুরুষই হউন আর নারীই হউন, তাঁহার মত নিতান্তই প্রলাপ। রাষ্ট্র সভ্যতার সহায় হইতেও পারে, না হইতেও পারে, কিন্তু রাষ্ট্রিক গঠন সভ্যতার মূল হইতে পারে না। বহু অসভ্য জাতি স্বেচ্ছাচারী দলপতি দ্বারা শাসিত। আবার অন্যান্য বহু অসভ্য জাতির শাসনপ্রণালী গণতন্ত্রে অধিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। এথেন্‌সের গৌরবময় যুগে এথেন্‌সের মুক্ত নাগরিকেরা ধনতন্ত্র দ্বারা শাসিত হইত; এবং এই শাসনযন্ত্রের ভার বহন করিত ভোটহীন দাসমণ্ডলী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের রাজতন্ত্র প্রায় স্বেচ্ছাচারীই ছিল। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ অপেক্ষা কোনও বৃহত্তর সত্তার সঙ্গেই সভ্যতা সংশ্লিষ্ট।

কতকগুলি বস্তুকে কখনও কখনও সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া ভুল করিলেও সেগুলি যে আসলে তাহা নহে ইহা সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি অপ্রয়োজনকে ছাঁটিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আদিম বৃত্তির সহিত বর্ব্বরতার কোনও বিরোধ নাই, দেখিয়াছি। জেলিফিশও প্রকৃতির নিয়ম পালন করে। সভ্য ও বর্ব্বরসমাজের বিভিন্নতাসূচক কোনও বিশিষ্ট রাষ্ট্রিক গঠনের পরিচয়ই আমরা পাই নাই। বর্ব্বর বাহিনী বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে এবং পরাক্রান্ত রাষ্ট্রসমূহকে পরাভূত করিয়াছে। পরিশেষে,—যদিও পরবর্ত্তী অধ্যায়ের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিতেছি—যে সমস্ত সমাজকে শিক্ষিত জনসমাজ অতি সুসভ্য বলিয়া সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহাদের সকলেই যান্ত্রিক আবিষ্কার বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে এমন কিছু উন্নত অবস্থায় তুলিতে সক্ষম হয় নাই। শিক্ষিত বিচারবুদ্ধি যে সমস্ত জনসমাজকে বিশেষরূপে সভ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহাদের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই এমন কতকগুলি লক্ষণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যেগুলি এইসব সমাজেই বর্ত্তমান, এবং সেইগুলিই হইবে সভ্যতার লক্ষণ।

যিনি এই সব সমাজের সমৃদ্ধ সভ্যতা সম্বন্ধে শিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের গৃহীত অভিমতের সহিত একমত নহেন, তিনি আমার প্রমাণই গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য। তাঁহার নিকট এই নিবন্ধ নিতান্তই পুঁথিগত বিদ্যার বিষয়। তিনটি বিভিন্ন সমাজের সভ্যতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেরূপ একমত তাহাতে এই মতকে সর্ব্ববাদীসম্মত বলা যাইতে পারে, এবং ইহারই বলে আমি এই সমাজগুলির সভ্যতাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।

এমন কথা বলিতেছি না, স্বপ্নেও নয়, যে শুধু এই সমাজগুলিই উচ্চ সভ্যতা লাভ করিয়াছে। আমি এমন তিনটি সভ্যতা নির্ব্বাচিত করিয়াছি যাহাদের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনও বিতর্কের অবকাশ নাই, এবং যাহাদের সহিত আমার কিছু পরিচয় আছে। অনেক সমাজ আছে যাহাদের সুসভ্য বলিয়া দাবী করিবার অনেক উপাদান থাকা সত্ত্বেও তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তিও প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সভ্যতার লক্ষণ আবিষ্কার করিতে যাওয়া সমীচীন হইবে না, ইহা সুপ্রতাক্ষ। আরও কতকগুলি সমাজ আছে যাহাদের সভ্যতা তর্কের বহির্ভূত, কিন্তু বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখা যায় ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ যে এইসব সভ্যতার মধ্যে কোনও বিশেষ লক্ষণকে আমরা নিঃসংশয়ে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি না। যাহা হউক, অনেকে জোর করিয়া বলিবেন, আমার তালিকা আরও বর্দ্ধিত করা উচিত ছিল। তাঁহাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—যতক্ষণ তাঁহাদের

অভিপ্রেত সমাজে আমার নির্ব্বাচিত তিনটি সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত না দেখেন, ততক্ষণ যেন আমার সিদ্ধান্তের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত না হন। আমি যে গুণগুলিকে সভ্যতার প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি তাঁহারা সেগুলির পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলেও আমাদের মতে মূলগত কোনও বিরোধ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের উভয়েরই আশ্রয়স্বরূপ সুপরিসর ভূমি তখনও বর্ত্তমান থাকিবে এবং আমার সিদ্ধান্ত সেখানে স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতে থাকিবে এই আমার স্থির বিশ্বাস; কার্য্যকালে কি হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

ধ্রুপদ

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সঙ্গীতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মার্গ ও দেশী। তাঁহাদের মতে 'মার্গ' অন্বেষণে অর্থাৎ স্বরব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে যে পথ অবলম্বন করিতে হয় তাহাই মার্গ সঙ্গীত। সাধারণ ভাষায় ইহাকেই উচ্চ সঙ্গীত বলে। আর 'দেশে দেশে জনানাং যদ্রুচ্যা হৃদয়রঞ্জকম্' অর্থাৎ দেশে দেশে বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন জনগণের হৃদয়রঞ্জনের জন্য যে সঙ্গীত প্রবর্ত্তিত হয় তাহাকে 'দেশী' সঙ্গীত বলে। এই সঙ্গীত সাধারণের রুচি তৃপ্ত করে বলিয়া ইহার কোনও বিশিষ্টরূপ নাই; রাগরাগিণীর সৃষ্টি বা উন্নতির ইহাতে অবকাশ নাই। মার্গ সঙ্গীত একটি বিরাট শিক্ষা ও সাধনার বস্তু।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে ধ্রুপদ সঙ্গীতেরই প্রাধান্য ছিল। তানসেনের সময় পর্য্যন্ত এই প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ অর্থে বিষ্ণুপদ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদ বুঝায়। ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীতের বিশেষ একটি ঢংকে ধ্রুপদ বলে। সুরের দিক দিয়া ধ্রুপদের মর্য্যাদা যেমন শ্রেষ্ঠ, যে ভাষায় ধ্রুপদ সঙ্গীত রচিত কাব্যের দিক দিয়াও তাহার গাম্ভীর্য্য ও স্থির প্রশান্তি আমাদের মনকে অভিভূত করে। এই সঙ্গীতরীতি প্রবর্ত্তনের আদিতে প্রার্থনা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত বিজড়িত ছিল বলিয়া আজও গানের আসরে ইহার আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভজন ও কীর্ত্তন ধর্ম্মসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু ধ্রুপদের ন্যায় উহাদের পরিকল্পনা বিরাট নহে। সুরের বৈচিত্র্য ইহাদের মধ্যে ধ্রুপদের তুলনায় নিতান্ত অল্প। ধ্রুপদ সঙ্গীতের জনৈক ভক্ত লিখিয়াছেন, "Nothing in Indian music approaches the stately simplicity, the nobility, the majesty, and grandeur of Dhrupada. The succession of notes in a Dhrupada song resembles the simple severe and noble lines of a Doric temple". "ধ্রুপদ গানের গাম্ভীর্য্য, সুরের বৈচিত্র্য এবং কাব্যের পূর্ণতা তাহাকে অন্যান্য শ্রেণীর গান অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধে স্থান দিয়াছে। অবশ্য প্রত্যেক শ্রেণীর গানেরই বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব মাধুর্য্য আছে; কিন্তু উপলব্ধির সুসংযত উপভোগজনিত চিত্তের যে প্রসাদগুণ আমরা লাভ করিয়া থাকি অন্যান্য কোনও সঙ্গীতেই তেমন প্রভাব

অনুভব করি না। ধ্রুপদে রাগরাগিণীর সম্যক্‌রূপ সুদৃঢ় ভাস্কর্য্যের ন্যায় আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ধ্রুপদ ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীনতম রূপ। ধ্রুপদেই রাগরূপের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়। রাগরাগিণী সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাহাদের বাদী সম্বাদী বিবাদী স্বরের প্রয়োগ বুঝিতে হয় এবং তাহা একমাত্র ধ্রুপদ সঙ্গীতেই অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আরোহণ অবরোহণের ক্রম, মূর্চ্ছনা প্রভৃতির যথাযথ প্রয়োগ ধ্রুপদেই পরিলক্ষিত হয়। ধ্রুপদে সাধারণতঃ চারিটি তুক (কলি) থাকে :—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। আস্থায়ীতে গানের স্থিতি বা প্রতিষ্ঠা হয় এবং স্বরের বিশেষ অংশ পর্য্যন্ত ইহা সীমাবদ্ধ থাকে। অন্তরাতে রাগের বিকাশ হয় এবং মুদারা ও উদারা সপ্তক হইতে, তারা সপ্তকে সুর আরোহণ করায়, আস্থায়ী হইতে ইহার প্রভেদ বুঝা যায়। আস্থায়ী ও অন্তরার স্বরকে উদারা, মুদারা ও তারা সপ্তকের মধ্যে যথাযথ প্রকাশ করাই সঞ্চারীর কার্য্য এবং আভোগে রাগরাগিণীর পূর্ণ বিকাশ হয়, এবং আভোগের পরই অস্থায়ীতে ফিরিয়া গানের সমাপ্তি হয়।

রাগরাগিণীর মধ্যে বাদী সম্বাদীর প্রয়োগ কৌশল ধ্রুপদেই সীমাবদ্ধ না হইলেও ধ্রুপদ গান যেমন আদ্যোপান্ত বাদী সম্বাদীর নিয়মাধীনে চলে খ্যালের তান বিস্তারে সে নিয়ম সময় সময় অমান্য করা হয়। কিন্তু সুনিপুণ শিল্পীর প্রয়োগ-কৌশলে শাস্ত্র-সম্মত স্বর প্রয়োগের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিলেও তাহাতে রাগরূপের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। ধ্রুপদের গঠনপদ্ধতি যে বাদী সম্বাদী দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কোনও বিশেষ রাগ বা রাগিণীতে যে স্বর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হয় এবং যাহার দ্বারা রাগরূপের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ হয়, তাহাকে ঐ রাগ বা রাগিণীর বাদী স্বর বা প্রধান স্বর বলে। 'সঙ্গীত রত্নাবলী'র মতে

স্বামিবদ্বদনাদ্বাদী স রাগ প্রতিপাদকঃ
বাদিনা সহ সংবাদাৎ সংবাদী মন্ত্রিতুল্যকঃ।
মুখে তস্যানুবদনাদনুবাদী চ ভৃত্যবৎ
তথা বিবাদাত্তেনৈব বিবাদী বৈরীবদ্ভবেৎ॥

সম্বাদী বাদীকে সাহায্য করে; অনুবাদী স্বর ভৃত্যের ন্যায় বাদী সম্বাদীর আজ্ঞা পালন করে। দেশে যেমন রাজার শত্রু থাকে, তদ্রূপ বিবাদী স্বরেরও অস্তিত্ব রাগে বর্ত্তমান। বিবাদী স্বরের অযথা প্রয়োগে রাগ ভ্রষ্ট হয়। তাহাকে যথাস্থানে আবদ্ধ রাখাই বাদী সম্বাদীর কার্য্য; যেমন শত্রুকে বন্দী করিয়া রাখা রাজার কর্ত্তব্য। বিবাদী স্বরের চলাচল সীমাবদ্ধ, গণ্ডীর বাহিরে যাওয়া তাহার পক্ষে

একেবারে নিষিদ্ধ। যে রাগ বা রাগিণীতে যে স্বর একেবারে ব্যবহার হয় না, তাহাকে ঐ রাগ বা রাগিণীর 'বর্জ্জিত স্বর' বলে। নিম্নে 'দেশ' রাগের স্বর বিন্যাস করিয়া বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী, বিবাদীর বিশ্লেষণ করা যাইতেছে :—

সা রে মা পা নি
র্সা ণি ধা পা মা গা রে সা।

স্বরের উত্থানে অর্থাৎ আরোহীতে গা ও ধা ব্যবহার হয় নাই; কিন্তু অবরোহীতে ঐ দুইটি স্বর ব্যবহৃত হইতেছে। এই দুইটি স্বরকে বিবাদী বলা যায়, কারণ আরোহণে উহাদের স্থান নাই, অবরোহণের ক্ষেত্রেই উহাদের গতি সীমাবদ্ধ। 'দেশ' স্বরে বাদী 'মা' এবং সম্বাদী 'সা'; কারণ মধ্যমই 'দেশ' রাগের প্রধান সুর, এবং তাহার প্রকাশের সহায়তা করে ষড়জ। মালকৌশ রাগে ঋষভ ও পঞ্চম একেবারেই ব্যবহার হয় না, কাজেই রে, পা মালকৌশের বর্জ্জিত স্বর। বিবাদী স্বর সম্বন্ধে 'সঙ্গীতদামোদর' বলেন

"আরোহে বর্জ্জিত স্বরো বিবাদ্যবরোহে ক্বচিৎ"

অর্থাৎ আরোহণে যে সুর বর্জ্জিত হয় অবরোহণে কখনও কখনও প্রযুক্ত হইলে সেই স্বরকে বিবাদী সুর বলে। এই প্রসঙ্গে গুর্জ্জরী * তোড়ীর স্বরবিন্যাসে বাদী ও সম্বাদীর স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। গুর্জ্জরীতে রে, গা ও ধা কোমল লাগে এবং শুদ্ধ ও কোমল নি ব্যবহার হয়।

স ঋ জ্ঞ ম প দ ন র্সা
র্স ণ দ প ম জ্ঞ ঋ স।

গুর্জ্জরী তোড়ী গাহিতে হইলে বা তাহার স্বরবিন্যাস দেখাইতে হইলে প্রথমেই কোমল দৈবতে আরম্ভ করিতে হয়। যেমন—

দ ণ দ পা মা জ্ঞা ম প ম জ্ঞ ঋ জ্ঞ ঋ স
— — — — — — — —

স্বরগুলির মধ্যে যেগুলির নিম্নে চিহ্ন বর্ত্তমান সেইগুলিই গুর্জ্জরী তোড়ীর বাদী ও সম্বাদী সুর। প্রবন্ধের উপসংহারে সন্নিবিষ্ট ধ্রুপদটি গাহিলেই গুর্জ্জরী তোড়ীর রূপ সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ধ্রুপদ কণ্ঠসঙ্গীতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার ঢং, রচনাকৌশল, স্বর-সংযোজনা অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গীত হইতে পৃথক। ধ্রুপদ হইতেই খ্যাল সৃষ্টি হয় এবং পরে খ্যাল হইতে টপ্পা এবং টপ্পা হইতে ঠুমরী রচিত হয়। আধুনিক ও গ্রাম্য সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের সহিত

* গুর্জ্জরী তোড়ীর স্বরলিপি প্রবন্ধের উপসংহারে দ্রষ্টব্য।

কোনও সম্বন্ধ নাই। ধ্রুপদ সঙ্গীতের শব্দ সংযোজনা সুরের ভাবানুযায়ী হয় এবং তাহার কাব্যমাধুর্য্য অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গীত হইতে স্বতন্ত্র। সমস্ত রাগরাগিণীতেই ধ্রুপদ গীত হয়, কিন্তু সমস্ত তালে হয় না। চৌতাল, ধমার, সুরফাঁক্তা, ঝাঁপতাল, তেওরা, আড়া চৌতাল, ব্রহ্মতাল প্রভৃতিতে ধ্রুপদ গীত হয়। একই রাগ ধ্রুপদ ও খ্যালে বিভিন্নভাবে গীত হয়, যদিও রাগের গঠন প্রণালী একই থাকে। সুরের ধীর গতি, লয়ের গতি, সুরের নিরাভরণ সৌন্দর্য্য এইসব মিলিয়া যে সুষমা সৃষ্টি করে, তাহাই ইহার বৈশিষ্ট্য। খ্যাল প্রভৃতি গানে একই রাগ গাহিবার পৃথক রীতির অনুবর্ত্তী হওয়ার জন্য একই গঠন সত্ত্বেও ধ্রুপদের শান্ত উদার ভাব সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় না।

বৈদিক যুগের পরেই যে সঙ্গীতের ধারা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হয় তাহাকেই অধুনাপ্রচলিত ধ্রুপদের আদি অবস্থা বলা যাইতে পারে। সামবেদের মন্ত্র সুরসহযোগে গীত হইত; তেমনি ধর্ম্মোপাসনায় ব্যবহৃত সঙ্গীত হইতেই ধ্রুপদের উৎপত্তি। গোয়ালিয়রের এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ধ্রুপদ গান কেবল মাত্র ঈশ্বরোপাসনা কিম্বা ভজনার জন্য ব্যবহৃত হইত। বস্তুত প্রাথমিক যুগে ধ্রুপদ ধর্ম্মসঙ্গীতেরই অন্তর্গত ছিল। ক্রমশ ইহার সুর তাল ঢং প্রভৃতির উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবারে প্রবেশ লাভ করে। ধ্রুপদ গানের যে কয়েকটি রূপভেদ আছে, তাহার মধ্যে 'হোরী' অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণের দোললীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে গান রচিত হইত তাহাকেই হোরী বলে। মনে হয় কোনও এক সময়ে হোলি উৎসবেই এই গান প্রথম গীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে এই সকল গান স্বীয় বৈশিষ্ট্যে স্বধীসমাজ কর্ত্তৃক একটি বিশেষ শ্রেণীগত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহাতে ধ্রুপদের সমস্ত অঙ্গই বর্ত্তমান।

পুরাণে বর্ণিত আছে মহাদেব সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাঁহার গ্রন্থে সঙ্গীত বিষয়ক অনেকগুলি সূত্র লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই শাস্ত্রে বীণা, বংশী ও মৃদঙ্গের উল্লেখ আছে। মৃদঙ্গবাদন ধ্রুপদের পক্ষে অপরিহার্য্য। সুতরাং অনুমান করিলে দোষের হইবে না যে নাট্যশাস্ত্রের সময়েই ধ্রুপদের অস্পষ্ট রূপ পরিচিত ছিল। আধুনিক ধ্রুপদের পরিপূর্ণ বিকাশের সহিত যাঁহার নাম বিজড়িত তিনি সম্রাট আকবর শাহের সভা গায়ক সুকবি তানসেন।

সম্রাট আকবরের অতুলনীয় গুণগ্রাহিতার ফলে তাঁহার সভায় কবি, গায়ক, শিল্পীদের যে সৌরলোক সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার অন্যতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন তানসেন। ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করিতে গেলেই তানসেনের নাম সসম্ভ্রমে স্মরণীয়। তিনি শুধু অসাধারণ গায়কই ছিলেন না; তাঁহার কাব্য-প্রতিভাও

অসাধারণ ছিল। তাঁহার প্রভাব আজ পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বত্র অপ্রতিহত আছে। তাঁহার রচিত গানগুলি সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—ঈশ্বর বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়ক, দেবদেবী এবং ব্যক্তি বিশেষের বর্ণনা ও রাগরাগিণীর বর্ণনা। ঈশ্বরের স্তুতি ও প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁহার অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সুর-সংযোজনার কৌশল অতি উচ্চাঙ্গের। তাঁহার সুরের এমন একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে যে গাহিলেই বুঝা যায় ইহা তানসেনের রচনা। তানসেনের এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বহু রচয়িতার ধ্রুপদ গানগুলি সমস্তই হিন্দীতে রচিত; কিন্তু ইহাতে ব্রজভাষা ও চলতি গ্রাম্য ভাষার বহু শব্দ নিয়োজিত হইয়াছে। যুক্তাক্ষরের ব্যবহার সুরের স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে প্রতিহত করে, সেইজন্য প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতাগণ গানের জন্য এমন একটি বিশেষ ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহা সুরের সংযোজনার পক্ষে সমাক উপযোগী। এই ভাষায় শুধু ধ্রুপদ নহে, তৎপরবর্ত্তী সকল শ্রেণীর গানই রচিত হইয়াছিল। এই ভাষা সকল সময়ে ব্যাকরণ-সম্মত না হইলেও ভাবপ্রকাশের পক্ষে উহা অতি প্রাঞ্জল। হিন্দুস্থানী ভজন গানে, বাঙ্গালার কীর্ত্তনে শব্দের আড়ম্বর প্রয়োগ করা চলে, কারণ এই দুই শ্রেণীর সঙ্গীতই কাব্যপ্রধান ও ভক্তিরসাত্মক। তবে তুলসীদাস, সুরদাস প্রভৃতি হিন্দী কবিগণও গানের জন্য অনেক কবিতা প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়াছেন। গায়ক কবিগণ প্রথমে সুর কল্পনা করিয়া পরে ভাষা সংযোগ করেন; সেইজন্যই ভাষাকে সুরের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়।

তানসেনের পূর্ব্বে ও পরে বহু প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ রচয়িতার আবির্ভাব সত্ত্বেও জনপ্রিয়তায় কেহই তানসেনের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। দিল্লী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকেন্দ্রে ধ্রুপদ সঙ্গীতের অনুশীলন চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিষ্ণুপুরে তানসেনের বংশধর বাহাদুর সেন কর্ত্তৃক প্রকৃত ঢংয়ের ধ্রুপদ প্রচারিত হয়। বাঙ্গালা দেশে যে সকল সঙ্গীতাচার্য্যগণ উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ রচনা করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের গান আজও সকলে গাহিয়া থাকেন তন্মধ্যে অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও যদু ভট্টের নাম সঙ্গীতামোদীর নিকট সুপরিচিত। আজও বাঙ্গালা দেশে যেরূপ বিশুদ্ধ ঢংয়ের ধ্রুপদ প্রচলিত আছে ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশে তাহা নাই।

ধ্রুপদ গানের মধ্যে আবার কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আছে; যথা—প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, হোরী, রাগমালা। যে ধ্রুপদে প্রত্যেক তুকে ভিন্ন ভিন্ন তাল ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম প্রবন্ধ। যে শ্রেণীর ধ্রুপদ গানে একজন গান গাহিয়া থাকেন এবং অপর একজন 'সরগম্' করেন তাহাকে 'যুগলবন্ধ' বলে। হোরীর কথা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একই গানে বিভিন্ন রাগের সমাবেশ থাকিলে তাহাকে 'রাগমালা' বলে। 'রাগমালা' ধ্রুপদ ও খ্যাল উভয় শ্রেণীর সঙ্গীতেই পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত 'ছন্দ' ও 'ধারু' ধ্রুপদ সঙ্গীতের অন্তর্গত কিন্তু ইহাদের পার্থক্য ছন্দে ও রচনার বিষয়বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহারাও ক্রমশ ধ্রুপদ সঙ্গীতের অন্তর্গত হইয়াছে। এই সমস্ত সঙ্গীতের মধ্যে 'হোরী'ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

উত্তর ভারতবর্ষের যে সঙ্গীতে আমরা অভ্যস্ত তাহাতে হিন্দু সঙ্গীতের অব্যাহত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। পারস্য সঙ্গীতের প্রভাবে হিন্দী সঙ্গীতের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে; কিন্তু দক্ষিণ ভারতে হিন্দু সঙ্গীতের আসল রূপ বহুদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ইদানীং কর্ণাটী সঙ্গীতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রভাব অল্পবিস্তর অনুভূত হইতেছে। সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করেন যে, মুসলমান শাসনকালে হিন্দু সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসার হয়, এবং পারস্য, আরব এবং তুর্কী দেশীয় সঙ্গীতের নানা প্রকার সুর সংমিশ্রণে উত্তর ভারতে যে সমৃদ্ধ সঙ্গীত কলার উদ্ভব হইয়াছিল, ধ্রুপদ সঙ্গীত তাহার শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্টতম নিদর্শন। এই ধ্রুপদের রূপ এখনও বাঙ্গালা দেশে বজায় আছে। নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে ভারতের প্রায় সমস্ত কেন্দ্রে গিয়া দেখিয়াছি ধ্রুপদ গানের উপযুক্ত অনুশীলন বাঙ্গালার বাহিরে কোথাও বড় একটা হয় না। পশ্চিমে ঘরওয়ানা ধ্রুপদ গায়ক যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সংখ্যায় নগণ্য। বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ গান রচনা করিয়া যাঁহারা এই সঙ্গীতকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। অল্পবিজ্ঞ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভক্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের উল্লেখ মাত্রেই নাসিকা কুঞ্চিত করিলেও মনে রাখিতে হইবে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী ঢঙে অসংখ্য বাঙ্গালা গান রচনা করিয়াছেন, যেগুলি ভাবমাধুর্য্যে এবং সুরের বিশুদ্ধতায় শ্রেষ্ঠ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সমকক্ষ। রবীন্দ্রনাথেরই রচিত গুর্জ্জরী তোড়ীতে গেয় একটি ধ্রুপদ গান এবং তাহার স্বরলিপি সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

গুর্জ্জরী তোড়ী—চৌতাল *

প্রভাতে বিমল আনন্দে, বিকশিত কুসুম গন্ধে
বিহঙ্গম গীত ছন্দে, তোমার আভাস পাই।
জাগে বিশ্ব তব ভবনে, প্রতিদিন নব জীবনে
অগাধ শূন্যপূরে কিরণে খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি॥

* তানসেন রচিত বিখ্যাত ধ্রুপদ "নাদ নগর বসায়ে" গানের অনুকরণে।

চারিদিকে করে খেলা বরণ কিরণ জীবন মেলা
কোথা তুমি অন্তরালে, অন্ত কোথায় অন্ত কোথায়
অন্ত তোমার নাহি, নাহি।

১´		০		২		০		৩		৪	
জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞঋা	ঋা	জ্ঞঋা	সা	সা	সণা	সা	সা	৷	-৷
প্র	ভা	তে০	বি	ম০	ল	আ	ন০	০	ন্দে	০	০
১´		০		২		০		৩		৪	
সা	ণ্া	সা	জ্ঞা	-৷	ঋা	জ্ঞঋা	সা	সণা	সা	ণ্দা	-৷
বি	ক	শি	ত	০	কু	সু০	ম	গ০	০	ন্ধে০	০
১´		০		২		০		৩		৪	
সা	সা	-৷	মা	-৷	পা	সদা	-৷	দা	ণা	দা	পা
বি	হ	০	ঙ্গ	০	ম	গী০	০	ত	ছ	০	ন্দে
১´		০		২		০		৩		৪	
মা	পা	দা	পা	মা	পা	মজ্ঞা	-৷	-৷	জ্ঞপা	মদা	-৷
তো	মা	র	আ	ভা	স	পা০	০	০	ই০	০০	০
১´		০		২		০		৩		৪	
মা	-৷	ণদা	ণা	র্সা	র্সা	ঋ্ঁা	ঋ্ঁা	র্সা	র্সণা	র্সা	র্সা
জা	০	গে০	বি	০	শ্ব	ত	ব	ভ	ব০	০	নে
১´		০		২		০		৩		৪	
ণা	দা	ণর্সা	জ্ঞা	ঋ্ঁা	র্সা	ঋ্ঁা	সণা	র্সা	ণা	দা	পা
প্র	০	তি০	দি	০	ন	ন	ব০	জী	ব	০	নে
১´		০		২		০		৩		৪	
মজ্ঞা	মজ্ঞা	মা	পা	-৷	পা	ণদা	ণদা	দা	পমা	পা	পা
অ০	গা০	ধ	শূ	০	ন্য	পু০	রে০	কি	র০	০	ণে
১´		০		২		০		৩		৪	
সা	সা	সা	দা	দা	দা	ণদা	ণদা	দা	পমা	পা	পা
খ	চি	ত	নি	খি	ল	বি০	চি০	ত্র	ব০	র	ণে

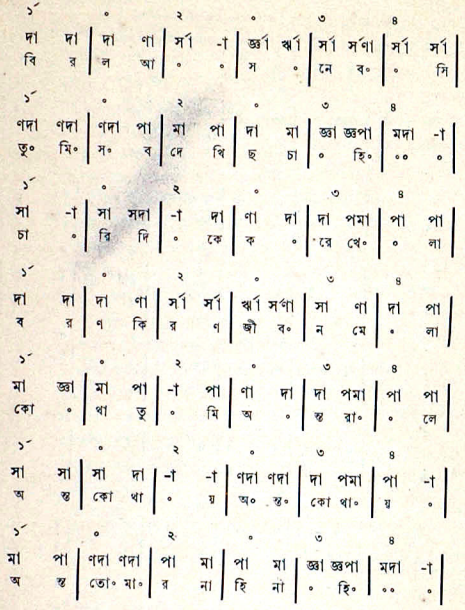

বর্তমান পলিটিক্‌সের পথ

শ্রীগোপাল হালদার

স্বীকার করা উচিত ভারতবর্ষের আধুনিক পলিটিক্‌সের পথ চিনিবার পক্ষে আলোকের অভাব নাই—ভারতীয় পলিটিক্‌সের প্রত্যেকটি কোণ বাক্যে ও বিবৃতিতে উদ্ভাসিত। যেমন, (১) সিমলা হইতে গান্ধীজী রিক্তহস্তে ফিরিতেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিবৃতিতে জানাইতেছেন, "সাবধান! কেহ কিছু করিয়া বসিও না।" "(২) আর পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার অষ্টোত্তর শতভাষণে বলিতেছেন, "হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার! এবার কিছু করিতেই হইবে, তাহা যেন মনে থাকে।" (৩) এবং অনতিভাষী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তখনই জানাইতেছেন, "ঠিক হ্যায়! কংগ্রেস অহিংসার ফকিরের আস্তানা নয়।"

(৪) এদিকে ত্রয়োবিংশখণ্ড বিবৃতি শেষ করিতে না করিতেই কমরেড মুকুন্দলাল সরকার চতুর্বিংশখণ্ড বিবৃতিতে ঘোষণা করিতেছেন "স্থানীয় সংগ্রামগুলি আজ ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রচেষ্টায় 'জাতীয় সংগ্রামে' পরিণত হইয়াছে।"

বিবৃতি-বর্তিকা ও সন্ধানী আলো

পলিটিক্‌সের এই বর্ত্তমান পথে বিবৃতি-বর্তিকা ছাড়াও প্রতিনিয়ত বহুসন্ধানী আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে।

(৫) বোম্বাইতে গান্ধীপন্থী সোশ্যালিষ্ট নেতা বলিতেছেন, "বিদায়! আবার কবে দেখা হইবে কে জানে? সত্যাগ্রহের আর দেরী নাই। শুধু ব্যক্তি বিশেষের সত্যাগ্রহ নয়—ভিতরের খবর এই যে, জনগণের ব্যাপক আইন অমান্যই স্থিরীকৃত হইয়া আছে।"

(৬) দিন দশেক পূর্বে বোম্বাইএ গৃহীত গান্ধী-প্রস্তাবের পরে গান্ধী-পন্থী শ্রমিক-নেতা বুঝাইলেন, "এই তো ঠিক। জেনারেলের কথামত স্থির না থাকিতে পারিলে কিসের মিলিটারি ডিসিপ্লিন্?"

(৭) পুনা-প্রস্তাবের পরে বড়লাটের উত্তর বাহির হইলে, ওয়ার্দ্ধার বিশেষ বিশ্বস্ত বন্ধুর কথা তুলিয়া বাতিল 'বি-পি-সি-সি'র অন্যতম নেতা বুঝাইলেন: "এবার 'জাতীয় সংগ্রাম' স্থির। হাইকম্যাণ্ড আপোষ করিতেছে—

জওহরলালই বড়লাটের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাগ্র। ওয়ার্দ্ধার ভিতরের খবর এই। অতএব, আমরা আপোষ-হীন সংগ্রামের দল এবার নামিয়া পড়িতেছি।"

(৮) ঠিক সেই সময়েই সেই বি-পি-সি-সি'র ঊর্ধ্বতন নেতা সংক্ষেপে এবং সঙ্কোপনে জানাইলেন, "গান্ধীজীর সঙ্গে আমাদের বুঝাপড়া প্রায় ঠিক।"

(৯) আবার তেমনি প্রতিষ্ঠাবান সেই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মহারথী উৎফুল্লচিত্তে বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে বাংলার মন্ত্রিত্ব ব্যাপারে হক্-নাজিমুদ্দীনদের কথাবার্ত্তা প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় কংগ্রেস আপত্তি করিলে সে আপত্তি আমরা শুনিব কেন? বাংলার ক্ষমতা এবার হাতে আনিতেছি।"

(১০) বামপন্থী নেতা তর্ক করিতেছিলেন, "না, ভারতীয় বুর্জোয়াজী সংগ্রাম করিবেই। রেলওয়ে, শিপিং, টেক্‌সটাইল, আয়রণ এণ্ড ষ্টিল প্রভৃতি সর্বদিকে, সাম্রাজ্যবাদ তাহাদের বঞ্চিত রাখিয়াছে। অতএব যদি বা কিছু পাইয়া এখন ভারতীয় বুর্জোয়ারা আপোষ করে তবু শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম না করিয়া তাহাদের পথ নাই। তখন কংগ্রেসের মধ্য হইতেই আসিবে সে আহ্বান।"

(১১) রাজকোটের জন-আন্দোলনকে গান্ধীজীর ব্যক্তি-সাধনার বিষয় করিয়া তোলা, দেশের গণ-আন্দোলনের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাস প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া অন্যতম বামপন্থী বলিলেন, "একবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইলে কি আর তাহা সীমাবদ্ধ থাকিবে? তাহা অসম্ভব। আর গান্ধীজী ও কংগ্রেসকে আমরা জনমতের চাপে সত্যাগ্রহে নামাইয়া ফেলিতেও পারিব।"

দেশী পলিটিক্‌সের এই শতরঙা আলো বিদেশীয় পলিটিক্‌সের আকাশকেও বিচিত্রতর করিয়া তোলে। আজ দেশের পলিটিক্‌স আর বিদেশের পলিটিক্‌স একেবারে বিজড়িত তাহা মনে রাখা উচিত।

(১২) তখনও মানবেন্দ্র রায় "আলোক-প্রাপ্ত" হন নাই—রামগড়ের আপোষ বিরোধী সম্মেলনের মাস দুই পরে ফরওয়ার্ড ব্লকের বর্ত্তমান নেতা সর্দার শার্দ্দুল সিং কবীশ্বর সংবাদপত্রে ঘোষণা করিলেন, "যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে আমাদের সৈনিকাদি দান করা প্রয়োজন।" উহারই বিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া তখন ফরওয়ার্ড ব্লকের বিহারী সৈনিকেরা জেলে যাইতেছিল।

(১৩) মাসখানেক পূর্বে আবার তাঁহারই অন্যতম মহারথী গোপনে জানাইলেন, "একটু সবুর কর, যুদ্ধটা জমিতে দাও। জাপান অপেক্ষা করিতেছে—"

(১৪) অন্যদলীয় বামপন্থী তখনই বুঝাইতেছিলেন, "যুদ্ধটা জমিতে দাও—জার্মানি ইতালি জাপান সবে মিলিয়া এমন খাওয়া-খাওয়ি করিবে যে, আমাদের স্বাধীনতার পথে উহারা বাধাই হইতে পারিবে না।"

(১৫) সাম্যবাদী-পরিচিত বুদ্ধিবিলাসী বলিলেন, "অপেক্ষা কর। শোন নাই, পেশোয়ারে লোকজন সরানো হইতেছে? সোভিয়েট যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রায় আসিয়া গেল। জান না, হিটলার-ষ্টালিনের এই চুক্তি?"

(১৬) স্বাধীনতা যে প্রায় আসিয়া গিয়াছে তাহা বুঝাইয়া জনৈক কংগ্রেস-নেতা বলিলেন, "কাল (১১ই আগষ্ট) জার্মান রেডিও বলিয়াছে, ভোভারে জার্মানরা অবতরণ করিয়াছে।" (ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার তিনিই জানাইয়াছিলেন, —প্রথম দূর-পাল্লার কামান যেদিন চলিল, আবার র‍্যামস্‌গেটের বাড়িঘর যেদিন বোমায় পুড়িল—ভোভারে উহারা নামিয়াছে।)

(১৭) অনুরূপ প্রত্যাশাই মনে লইয়া ঐরূপ জার্মান ঘোষণার বলে ঊর্ধ্বতন নেতা জুলাই'র প্রারম্ভে জানাইলেন, "২১শে জুলাই জার্মানি ব্রিটেন অধিকার করিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে—"

নেতৃলোক ছাড়াইয়া বক্তৃতাহীন জনলোক প্রবেশ করিলেও এমনিতর বহু ইঙ্গিতের সন্ধান মিলে। (১৮) কংগ্রেসের গান্ধীবাদী সদস্য বোম্বাই'র পূর্বে বলিলেন, "পথেই হয়ত সব ধরিয়া ফেলিবে—ফিরিতেই পারিব না। বিদায়।" (১৯) গান্ধী বিরোধী সদস্য বলিলেন, "গান্ধীজী কি কিছু করিবেন?" (২০) সাধারণ কংগ্রেস-ভক্ত কহিলেন, "কংগ্রেস এ কি করিতেছে?" (২১) বাংলার 'এ্যাড্ হকি'রা বলিতেছেন, "এখন সংগ্রাম নয়; আগে দরকার কংগ্রেসকে এ প্রদেশে পুনর্গঠিত করা।" (২২) বাতিল বি, পি, সি, সি বলিতেছেন, "সর্বত্রই সংগ্রাম করিতেছি; তথাপি সর্বাগ্রে এখন নিজেদের বি, পি, সি, সি, নির্মাণ করিতে হইবে।" এইরূপ অজস্র ও বিচিত্র আলোকের রূপায়ই বরং ভারতীয় পলিটিক্‌স্ আজ এত দুর্বোধ্য। সুস্পষ্ট শুধু এই কথাটি যে, কংগ্রেস পথ হারাইয়াছে; এই সব সর্বজ্ঞ নেতারা হারাইয়াছেন তাঁহাদের রাজনৈতিক ঠিকানা পর্য্যন্ত।

কংগ্রেসের পথ

কংগ্রেসের পথই অবশ্য ভারতবর্ষের প্রধান পলিটিক্যাল পথ। মুসলিম লীগের পথও ক্ষুদ্র নয়। কিন্তু অনেকাংশে তাহা কংগ্রেসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা চিহ্নিত। যেমন, স্বাধীনতা চাই, কিন্তু পাকিস্থানও চাই; যুদ্ধে সাহায্য করিব, কিন্তু স্বীকার করিব না সাহায্য করিতেছি; ইত্যাদি। হিন্দু সভার পথ লীগ ও কংগ্রেসের ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। তাহার ঝোঁকটা এইরূপ আমাদের সাহায্য লইলেই ত সব চুকিয়া যায়। তাহা ছাড়া, এই দুইটিই মূলত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রমার্গ; জাতীয় রাষ্ট্রমার্গ একমাত্র কংগ্রেস।

কংগ্রেস রাজপথ নয়; তবে তাহা রাষ্ট্র-পথ। রাজপথ সে হইবে যখন রাজদণ্ড তাহার হাতে আসিবে; কিন্তু রাষ্ট্রপথ সে হইয়াছে রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছে বলিয়া। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের পথ যে প্রধান পথ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহার পিছনে আছে কংগ্রেসের সেই ইতিহাস।

এই ইতিহাসটুকু ক্ষুদ্র পুঁজি নয়। (১) একদিন কংগ্রেস আরম্ভ হইয়াছিল আমাদের ইঙ্গ-ভারতীয় অ্যারিষ্টোক্র্যাসি ও ব্যারিষ্টোক্র্যাসির বড় দিনের বৈঠক হিসাবে। তাহার সেদিনকার রূপও ছিল তেমনি। সেদিনকার লক্ষ্য, সেদিনকার পদ্ধতি, সেদিনকার সভ্য-সংগঠনে, সেই রূপ প্রকাশিত হইত। তারপর কংগ্রেসেরও ক্রম-বিকাশ হইয়াছে। (২) স্বদেশীর যুগে আসিয়া কংগ্রেসের একবার রূপান্তর ঘটিল—লক্ষ্য হইল স্বায়ত্তশাসন, পদ্ধতি হইল স্বদেশী, অর্থাৎ দেশীয় বণিকতন্ত্রের বিকাশ, আর সভ্যরা হইলেন তেমনি সুশিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ। গত যুদ্ধের সময়েই সেই রূপও পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। (৩) সেই যুদ্ধের শেষে আসিয়া গান্ধীযুগের কংগ্রেস নবজন্ম লাভ করিল—লক্ষ্য হইল স্বরাজ, পদ্ধতি হইল স্ব-প্রয়াস, সংগঠন হইল স্বাধী, আর সদস্যদল নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ। ইহারই পরিণতি লাহোর-করাচী যুগের কংগ্রেসে ঘটিয়াছে। (৪) তখন কংগ্রেস রাজরোষের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল—কংগ্রেসের লক্ষ্য হইল পূর্ণ স্বাধীনতা, তাহার পদ্ধতি হইল সংগ্রামের পদ্ধতি, আর তাহার সংগঠন ক্রমশই হইয়া উঠিল ব্যাপকতর—নিম্ন মধ্যবিত্তের সীমা ছাড়াইয়া একেবারে জনসমাজ ছুঁইবার কল্পনাও তাহার মনে উদিত হইতেছিল।

কিন্তু এই উজান স্রোতের টানটা যতই প্রকট হউক, কংগ্রেসের ভিতরে ভিতরে বন্দরে নোঙর করিয়া বসিবার ইচ্ছাও আছে বেশ সুদৃঢ়। অর্থাৎ বিপ্লবের পার্শ্বেই রহিয়াছে তাহার বিরোধী ধারা। যেমন, প্রথম কথা, কংগ্রেস অতিকায় হইয়া উঠিতে গেল কিন্তু গণ-সঙ্ঘ হইয়া উঠিতে পারিল না। উহার সভ্যরা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে, থাকেও; বার্ষিক চার আনা চাঁদার সঙ্গে অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিলেই তাহাদের ভারতীয় স্বাধীনতার ব্রত উদযাপিত করা হয়। দায় ও দায়িত্ব তাহাদের নিকট হইতে কংগ্রেসও দাবী করে নাই; শুধু জন-সমাজের নিষ্ক্রিয় সম্মতিই চাহিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে জন-সমাজও খুশী হইয়াছে; কিন্তু কংগ্রেস সত্যাকারের সুসংহত গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা, কংগ্রেস সংগ্রামমুখী হইল বটে, কিন্তু নৈতিক আধ্যাত্মিক নানা কুয়াসায় মিলাইয়া সংগ্রামের যে বিশেষ পদ্ধতিটি কংগ্রেস আবিষ্কার করিল তাহাতে একদিকে যেমনি সংগ্রাম যখন-তখনি সুসাধ্য হইল, অন্যদিকে তেমনি সত্যাকারের সংগ্রাম চাপা দেওয়া গেল।

এই বিশেষ পদ্ধতিটি সত্যাগ্রহ। ভারতবর্ষের মত দেশে বাস্তব কৌশল হিসাবে ইহার যে বিশেষ স্থান আছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু ইহার বাস্তব ফলও বড় কিছু হইতে পারে না। আর ইহার নৈতিক উদ্দেশ্য শত্রুর মন জয় করা। কিন্তু শত্রু, যেখানে বিশেষ একটি অ-নৈতিক (Non-moral) অ-মানবীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা (System of Government) যেমন সাম্রাজ্যবাদ, সেখানে তাহার মন বলিয়া কোন জিনিষ নাই; তাহা জয় করিবার প্রশ্নও তাই উঠে না। কার্য্যত তাহা হইলে দাঁড়ায় এই—এই পদ্ধতিতে শত্রুকে বড় জোর বিড়ম্বিত করা চলে, বিতাড়িত করা চলে না; অবস্থার কিছুটা সংস্কার করা যায়, ব্যবস্থা (system) সমূলে সংহার করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োগক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, জন-চিত্তের ধূমায়িত ক্ষোভকে উহা জ্বালিয়া দিয়াই আবার নিবাইয়া দিয়াছে। খাণ্ডবদাহ ইহার অভিপ্রেত নয়। এইরূপে তৃতীয় কথাটিও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, কংগ্রেসের মধ্যে সংরক্ষণের চেষ্টাই সবল রহিয়াছে। সেই তৃতীয় কথাটি এই—অন্তদেশ স্বাধীনতা পাইলেই মনে করে সব হইয়াছে। কংগ্রেস কিন্তু চাহে 'পূর্ণ-স্বাধীনতা'। দুইটিতে নিশ্চয়ই প্রভেদ আছে। স্বাধীনতার অর্থ জানি; পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ কি? 'স্বাধীনতার সার' (Substance of Independence?), ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্? না ব্রিটেনের সঙ্গে ভাগাভাগি (Partnership with Britain)? মোটের উপর এই কংগ্রেস-ভাষ্য অস্পষ্টতর। এই সাম্রাজ্যবাদের অবসান অবশ্য সে চাহিয়াছে। কিন্তু তাহা এই অর্থে যে এই সমাজ-বিন্যাসটি পরিপক্ক ফলের মত ব্রিটেন তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইবে—কিন্তু ভারত-সমুদ্রে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই পাহারা দিবে, পাছে বাহির হইতে কেহ অহিংস দেশের সে স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইতে আসে কিংবা ভিতর হইতেই সমাজের কোনো বঞ্চিত অংশ নিজেদের অধিকার দাবী করিয়া উপদ্রব বাধাইয়া তোলে। ২৬শে জানুয়ারী যাহাই বিঘোষিত হউক, 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কোনো পূর্ণ পরিণতিই কংগ্রেস মানিতে প্রস্তুত হয় নাই।

তথাপি এইরূপ একটা অন্তর্বিরোধ লইয়াই কংগ্রেস ক্রমশ বাহির সমুদ্রের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছিল—আপত্তি করে নাই। কিন্তু একেবারে আপনার ভাগ্যের ভেলা সেই অকূলে ভাসাইয়া দিবার জন্যও মনে মনে সে প্রস্তুত হয় নাই। সে প্রয়োজনও তখন ছিল না। কারণ, কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত বেপরোয়া সুর চড়াইয়া যাইতে পারিয়াছে। কিন্তু মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দাবী তাহার পূরণ করিবার দায়িত্ব উপস্থিত হইল।

মন্ত্রিত্বের ভূমিকা

বর্ত্তমান কংগ্রেসের ইতিহাসে এই মন্ত্রিত্বের যুগ (১৯৩৭-৩৯) এক বিশেষ গুরুতর অধ্যায়। এইখানে পৌছিয়া ক্রমশই কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে। কিন্তু তাহারও পূর্বেই, আইন অমান্যের পরবর্তী সময়ে (১৯৩৩-৩৬), এই দ্বন্দ্বের ভূমিকা রচনা হইয়াছিল তাহা ভুলিলে চলিবে না। ভালো করিয়া বুঝিয়া রাখা দরকার কেন কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিল; তাহা হইলেই বুঝা যায় কেন কংগ্রেস তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটাইতে পারিল না।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সহজ অর্থটি এই যে, কংগ্রেস স্বীকার করিল যে, নিয়ম-তান্ত্রিকতার (Constitutional) পথ সে মানিয়া লইতেছে। তিন তিন বার বিপক্ষের সঙ্গে কংগ্রেস যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে, তিনবারই তাহার একমাত্র অস্ত্র ছিল সত্যাগ্রহ। উহার নৈতিক অধ্যাত্মিক স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া আর লাভ নাই; উহার রাজনৈতিক ফলাফল বিচার করাও নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মোটের উপর দেখা যায়, এই পথে অন্তত স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য গান্ধীজী বলিলেন, ঠিক মত সে অস্ত্র প্রযুক্ত হয় নাই, কিম্বা দেশবাসী সকলে সে অস্ত্র গ্রহণ করে নাই। যাহাই হউক, তিন তিন বারের অভিজ্ঞতায় কংগ্রেসের নায়কবৃন্দ নিশ্চিতরূপে বুঝিলেন, এই দেশে সত্যাগ্রহের দ্বারা অপেক্ষা সুষ্ঠু প্রয়োগ আশা করা দুরাশা; আর দেশবাসী সকলেই এই অস্ত্র প্রয়োগ করিবে, ইহাও অসম্ভব কল্পনা। গান্ধীজী অবশ্য এই দুরাশার কল্পনাকেই নিজের জীবনের ভিত্তিরূপ করিয়াছিলেন। তাঁহার আবিষ্কৃত সত্যাগ্রহরূপ টেক্‌নিক্ তাঁহার লক্ষ্য অহিংসারূপ মানব-মোক্ষের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বিজড়িত। তাই, তিনি এই তিন তিন বারের পরীক্ষার শেষেও আপনার মত পরিবর্তনের কারণ দেখিলেন না, বরং বুদ্ধদেব বা যীশুখৃষ্টও যাহা সাধন করেন নাই, তিনি তথাপি তাহাই সাধন করিতে সচেষ্ট রহিলেন। বুদ্ধদেব বা যীশু অহিংসাকে ব্যক্তিগত ও পরিবারগত সম্পর্কের বাহিরে প্রসারিত করিতে যান নাই; গান্ধীজী কিন্তু হৃদয়হীন রাজনীতির ক্ষেত্রেও অহিংসাকে জয়ী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু সকলে গান্ধীজী নহেন। মানুষ অনেকটা সভ্য হইয়াছে বটে, তথাপি মানুষই রহিয়াছে—এই কথাটি তাই সমস্ত আদর্শবাদ সত্ত্বেও শ্রীবল্লভভাই পটেল, বা শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালচারীর কাছে অজানা নয়। তাই, তিন তিন বারের সত্যাগ্রহের অভিজ্ঞতার পরে এই বিচক্ষণ কংগ্রেস নেতৃগণ মনে মনে স্বীকার করিলেন—"সত্যাগ্রহে নৈব-নৈব চ।"

অবশ্য প্রকাশ্যে তাহা স্বীকার করিবার পক্ষে তাঁহাদের বাধা ছিল অনেক।

প্রথমত, গান্ধীজীর নাম দেশবাসীর নিকট মন্ত্র স্বরূপ এবং গান্ধীজীর নীতি (Principle) ও টেক্‌নিক্ দেশের প্রতিষ্ঠাপন্ন শ্রেণীর পরিপোষক ও তাহাদের দ্বারা পরিপুষ্ট। এই শেষ কথাটির গুরুত্ব বুঝা যায় দ্বিতীয় কারণের বিষয়ে আলোচনা করিলেই। কিন্তু তাহার পূর্বে ইহা লক্ষ্য করা এখানে দরকার, গান্ধীজীর নাম ও নীতির যে আর্থিক ও রাজনৈতিক মূল্য আছে, মোহ আছে, কংগ্রেসের নেতৃ-সমাজ তাহা ত্যাগ করিয়া নিজেদের বুদ্ধি ও শক্তির উপর দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না। এখন দ্বিতীয় কারণটি দ্রষ্টব্য; আর ইহাই প্রধান কথা—বুদ্ধি বিচার করিয়া দেখিয়া কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বুঝিলেন যে, সত্যাগ্রহের পরিবর্তে যে উপায় বা নীতি অবলম্বন করা সম্ভব, তাহা, হয় নিয়মতান্ত্রিক শক্তি-সংগঠনের পথ, না হয় বৈপ্লবিক গণ-সংগঠনের পথ, অর্থাৎ হয় পার্লিয়েমেণ্টারিজম্ না হয় বেল্‌শেভিজম্। এই প্রশ্ন যে ক্রমশই স্পষ্ট হইতেছিল তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায় এই যুগে (আইন-অমান্যের পরবর্তী যুগে) কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও চেতনার প্রকাশে, এমন কি পণ্ডিত জওহরলালের এই সময়কার শাণিত লেখায়, জলন্ত কথায়, অশান্ত প্রয়াসে। নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণ-সংগঠন, এই দুই পথ যে স্বতন্ত্র হইবেই অবশ্য তাহার কোনও কারণ নাই। কৌশল হিসাবে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ গ্রহণ করিয়াও সত্যকার বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে তাহা প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই কৌশল বিশেষ প্রযুক্ত হয় নাই—গান্ধীজী দুই পক্ষকে একেবারেই স্বতন্ত্র মনে করিতেন বলিয়া। অন্যদিকে গণ-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা মানিলেও তাহার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ও বৈপ্লবিক প্রয়োগ গান্ধীজীর বা কংগ্রেসের মধ্যকার শক্তিশালী মণ্ডলীর নিকট গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, গণবিপ্লব ধনবিপ্লবের নামান্তর। এই হিসাবে দেশের প্রতিষ্ঠাপন্ন বিত্তবান শ্রেণী ইহার বিরোধী হইবেই। আবার, গণবিপ্লব সত্যাগ্রহের মূলনীতির পরিপন্থী, এই কারণেও গান্ধীজী উহার বিরোধী হইবেন। অতএব, সমাজতান্ত্রিক চিন্তা যতই কংগ্রেসের ধাদে উজান বহিয়া ছুটুক, পণ্ডিত জওহরলাল যতই গণোদ্বোধনের শঙ্খ নিনাদিত করিয়া ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ধাবিত হউন, কংগ্রেসের বুদ্ধিমান নেতৃদল বুঝিলেন (১৯৩৬) সত্যাগ্রহের শেষে (১৯৩৩-৩৬) পথ এখন রাজ-দরবারের দিকে। বিত্তবান সম্প্রদায় উল্লসিত হইলেন; নিয়ম-তান্ত্রিকতার পথে সংগঠন-মূলক কাজের সম্ভাবনা গান্ধীজীও অস্বীকার করিতে আর পারিলেন না, জানাইলেন, "Parliamentarism has come to stay." আর খানিকটা আপত্তি করিয়া পণ্ডিত জওহরলালও এক নূতন আলোক দেখিতে পাইলেন—মন্ত্রিত্বের তথ্‌ হইতে গণ-সংযোগের ও গণ-সংগঠনের কাজে অনেক বেশী সহায়তা করা সম্ভব।

মস্তিত্ব গৃহীত হইল। কারণ দেখানো হয়—(১) বৃটিশ শাসন অচল করা প্রয়োজন, (২) কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যধারার মধ্য দিয়া জনসাধারণকে সংগঠিত করা প্রয়োজন, (৩) আর প্রয়োজন কংগ্রেস কর্ম্মীর গণ-সংযোগ, ইত্যাদি। কংগ্রেস এই ভাবেই আপনার দুই মুখী চেষ্টাকে মানাইয়া লইতে গেল। কিন্তু এই মস্তিত্ব-গ্রহণে কংগ্রেস যে দুই মূল সত্যকে মানিয়া লইল তাহার উল্লেখও প্রকাশ্যে করিল না। তাহা এই—প্রথমত ব্রিটেনের 'ভারত শাসন আইন' একেবারে ফাঁকা নয়; দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ সত্যাগ্রহের দ্বারা সম্ভব নয়। স্বীকার না করিলেও সত্য সত্যই থাকে—আর কংগেসের মস্তিত্ব গ্রহণ তাহারই প্রমাণ। মস্তিত্ব যুগের ভূমিকা এইরূপ।

যুদ্ধের সম্মুখে

ইহার পর আসিয়া গেল মস্তিত্বের যুগ—তাহার পরিণতি আমাদের সুবিদিত। বলিতে গেলে পূর্ববর্তী এই ভূমিকা-ভাগ হইতেই সে দৃশ্য অনুমান করা চলে। মেটের উপর বলিতে পারি—কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক প্রেরণা ও সংরক্ষণ-চেষ্টায় প্রভেদ ঘটিতে লাগিল। ১৯৩৫ এর সেই শাসন-বিধানের 'ফাঁকা'-ক্ষমতার গুণে শ্রেণীগত পার্থক্য সুচিহ্নিত হইয়া উঠিল। বোম্বাই-কানপুর-মাদ্রাজে শ্রমিকের নব চেতনা কংগ্রেসগুলির প্রসাদ লাভ করিল। বিহারে কিষাণ-শক্তি কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ বলিয়া গণ্য হইল। ভারত-জোড়া দেশীয় রাজ্যের গণ-জাগরণ গান্ধী-প্রভাবিত কংগ্রেসের সহায়তার অভাবে অলিয়া অলিয়া নিবিয়া গেল। আপনার গণ-সংযোগের মঞ্চ, বৈপ্লবিক সম্ভাবাতাকে এমনি করিয়া অস্বীকার করিয়া কংগ্রেস এইরূপে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল সেখানে সে ভারতের 'স্বদেশী' বিত্তবাদীদের শক্তিকেন্দ্রস্বরূপ ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর পাদপীঠ হইতে চাহিতেছিল। ত্রিপুরীর ক্ষেত্রে সেই শ্রেণীই আপনার স্থান দৃঢ়তর করিয়া লইল। তাই গণ-পরিষদের (Constituent Assembly) এবং "দেশ-জোড়া সংগ্রামের" সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। অবশ্য, নেতৃত্ব-প্রাপ্ত গান্ধীজী শীঘ্রই জানাইয়া দিলেন—সংগ্রামের কোনও সম্ভাবনাই নাই।

ত্রিপুরীর সেই সঙ্কল্প-বাণীর হিসাব লইবার অবকাশ দেশবাসীর মিলিল না, প্রয়োজনও হইল না। আসিয়া পড়িল জার্মানীর যুদ্ধ। তাহার আগমন-বার্ত্তা কাহারও অজ্ঞাত ছিল না, কংগ্রেসেরও সে সম্পর্কে মত পূর্বেই ফৈজাবাদে, হরিপুরায় ত্রিপুরীতে স্থির করা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ বাধিতেই যে কৌতুকাবহ পরিচ্ছেদের সূচনা হইল, ঐ মতের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। তাই

বলিয়া রামগড়ে মস্তিত্ব-ত্যাগী কংগ্রেসের আর একবার গণ-পরিষদ ও জনসংগ্রামের বাণী মিথ্যা ঘোষণা করিতে অসুবিধা হইল না। কারণ সেনাপতি গান্ধীজী জানাইয়া দিলেন, সংগ্রাম সুদূর। তাহার পর? পুনার রাজাগোপালাচারীর জয় এবং বোম্বাইতে গান্ধীজীর পুনরাবির্ভাব দুইটি ঘটনাই উল্লেখযোগ্য। এই এক বৎসরে অন্তত এই সত্য প্রমাণিত হইয়া গেল (১) কংগ্রেস সদস্যদের মতের চাপে কংগ্রেস নেতৃত্বকে সংগ্রামে নামানোর কল্পনা অলীক, (২) কারণ, কংগ্রেস-সদস্যরা নিষ্ক্রিয় মত পোষণ করেন, তাহাদের সক্রিয় মতবাদ পোষণ করিতে হয় না, সে দায়িত্ব তাহাদের নাই, (৩) বরং গান্ধীজী সংগ্রামমুখী হইতে পারেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চাপে, (৪) কিংবা অহিংসাবাদের দায়ে।

এদিকে, যে কংগ্রেস-নায়কত্ব বুঝিয়াছিল সত্যাগ্রহ আর সম্ভব নয়, বুঝিয়াছিল নিয়মতান্ত্রিকতার পথই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাদের ভরসা ছিল নিয়মতান্ত্রিকতার অচল অবস্থা সৃষ্টিতে। ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়া তাঁহারা যখন হাঁড়ি চড়াইয়াছিলেন, তখন ভাবিয়াছিলেন, আরোহী-হারা উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চস্বরে তাঁহাদেরই আবার নিমন্ত্রণ করিবে—আহারান্তে তাঁহাদের ঘোড়ার ঘাস কাটিতে হইবে না। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল ব্রিটিশ-শাসন ঠিক অচল হয় নাই, কংগ্রেসই বরং অচল হইয়াছে। বুঝা গেল, এইভাবে চাপ দিয়া ক্ষমতা আদায়ের চেষ্টা আর বেশী দূর চলিবে না, আপাতত ঘোড়ার পীঠে আবার চড়িয়া বসিতে হইবে; পরে আবার সুযোগ মত নামিয়া আর এক দফা অচল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া আবার অধিকার আয়ত্ত করা যাইবে। অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত বুদ্ধিমানের এই মন্ত্রণা! এই বাস্তব জ্ঞানই মস্তিত্ব গ্রহণেও ইহাঁদের প্ররোচিত করিয়াছিল। এখন ইহাই অত্যন্ত ধীর ও স্থিরচিত্তে ইহাঁদিগকে কংগ্রেসের গৃহীত অগৌণ স্বাধীনতার দাবী, গণ-পরিষদের প্রস্তাব, ত্রিপুরী ও রামগড়ের সংগ্রাম সঙ্কল্প, যুদ্ধ বিরোধিতার প্রস্তাব এবং সর্বোপরি গান্ধীজীর অহিংসা মতকে অকুণ্ঠিতচিত্তে বিসর্জন দিতে প্ররোচিত করিল। পুণা প্রস্তাবে যদি কিছু প্রমাণিত হইয়া থাকে তাহা এই Rajagopalachariar cynicism! অহিংসা, সত্যাগ্রহ, গণ-পরিষদ কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবাবলী সেই তামিল বিচারে যে কি মূল্য লাভ করে তাহাই স্মরণীয়।

কংগ্রেস নেতৃত্বের এই গান্ধী-মুখোস খুলিয়া ফেলিল য়ুরোপের যুদ্ধ।

সেই যুদ্ধই আবার গান্ধীজীরও নেতৃত্বের স্বরূপ প্রকাশিত করিল বোম্বাইতে। পরিপূর্ণ নেতৃত্বই তিনি গ্রহণ করিলেন। অহিংসার এতবড় বাহনকে তিনি শূন্য ফেলিয়া রাখিতে পারেন না। মানবেতিহাসের এই সঙ্কট কালে তাঁহার এত

বড় মন্ত্রের পরীক্ষা করিবার সুযোগ তিনি অবহেলা করিবেন না। ভারতের স্বাধীনতা মুখ্য প্রশ্ন (immediate issue) নয়, মুখ্য প্রশ্ন অহিংসা ও অহিংসার প্রচারের সুযোগ;—স্বাধীনতা নয়, আর ব্যাপক জন-সংগ্রাম তো কিছুতেই নয়। পাপপূর্ণ পৃথিবীতে কলুষিত-চিত্ত জন-সমাজকে লইয়া তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন কিরূপে? হিংসার কলুষভার তৎপূর্বে দূর করা দরকার। এক বৎসর পূর্বে গত ডিসেম্বর মাসে যাহা লইয়া তর্ক করিয়াছিলাম—তাহা শীঘ্রই দেখা যাইবে। হয়ত গান্ধী সেবা-সঙ্ঘ বা গান্ধী-মার্কা অত্যন্ত পূত-চরিত্র অহিংসাবাদীরা সত্যাগ্রহের ছাড়পত্র পাইবেন। তাহা যাহাতে সাম্যবাদীরা ও বামপন্থীরা ব্যাপক করিতে না পারে সেইজন্য গান্ধীজী অবশ্যই পূর্ব হইতেই ঘাঁটি বাঁধিয়া রাখিবেন—বোম্বাই'র বিদায়কামী কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট, পণ্ডিতজী বা অন্য জায়গার সাম্যবাদীরা যাহাই মনে করুন। ইহাই অহিংসাত্মক নীতি—যে করিয়াই হউক গণ-আন্দোলন ঠেকাইতে হইবে। কারণ, জন-গণ সর্বক্ষেত্রে অহিংস থাকিতে চাহে না। আর, সত্যাগ্রহ বা প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করিবার জন্য, নৈতিক আধ্যাত্মিক সংগ্রামের জন্য, সর্বসম্মানিত মুষ্টিমেয় লোকের শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহই যথেষ্ট।

গান্ধী-নেতৃত্বের এই মূল-উদ্ঘাটনও বর্তমান যুদ্ধের কাজ।

যুদ্ধ তাই প্রমাণ করিয়া দিল—কংগ্রেস আর অগ্রসর হইতে চায় না; শুধু একই জায়গায় ঘুরপাক খাইতেছে। কিন্তু ঘুরপাক খাওয়ার নাম পথ চলা নয়।

কংগ্রেস নেতৃত্ব ও গণ নেতৃত্ব

কংগ্রেস এমন অচল নীতিতে অচল হইয়া উঠিল কেন, এই প্রশ্নের উত্তরও পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ হইতে আমরা সহজেই খুঁজিয়া পাইতে পারি। মন্ত্রিত্বের পূর্ব যুগে ও মন্ত্রিত্বের যুগে ক্রমশই কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝিয়া উঠিল যে, যে গণ-শক্তিকে তাহারা এতদিন নিজেদের উদ্দেশ্য-সাধনে প্রয়োগ করিবার কল্পনা করিতেছিল, সেই নবজাত গণ-চেতনা তাহাদিগকেই ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে—অতএব কংগ্রেসের বাহিরমুখী ধারাকে এবার ত্যাগ করিয়া ঘরমুখী ধারাতেই বহিয়া চলা এই নেতৃত্বের আত্মরক্ষার উপায়।

কথাটাকে আর একটুকু তলাইয়া বুঝিলেই দেখা যাইবে—আসলে কংগ্রেস-নেতৃত্ব আর গণ-নেতৃত্বে একটা মৌলিক বিরোধ রহিয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের সভ্যগণ আজ নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের; কংগ্রেসের নেতৃত্ব বিত্তবানদের হাতে। ভারতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ইহারা জন-সাধারণকে আহ্বান করে। অর্থাৎ কংগ্রেসের

নেতারা জন-গণের নেতা হইতে চাহেন, কারণ সেই জনশক্তির জোরেই তাঁহারা রাজশক্তি আয়ত্ত করিতে পারেন, অন্য পথ নাই। এই কারণেই তাঁহারা ক্রমাগত গণ-সংযোগ, গণ-জাগরণ প্রভৃতির দিকে নিজেরাও অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য দিকে আবার কথা আছে—কংগ্রেসের নেতারা গণ-নেতৃত্ব সৃষ্টি করিতে চাহেন না। কারণ গণ-নেতৃত্বের অর্থ মজুর-কিষানের নেতৃত্ব—বিত্তবানদের নেতৃত্ব নয়। এই শ্রমিক-কিষান বৃটেনের হাত হইতে রাজশক্তি জিনিয়া লইয়া তাহা যে এই স্বদেশীয় বিত্তবানদের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, এইরূপ আশা এখন নেতাদের নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। মস্ত্রিত্বের যুগে শ্রমিক ও কিষানের শ্রেণীবদ্ধ সংগঠন তাঁহারা দেখিলেন; তাহাদের অতি-স্পষ্ট দাবী ও ক্রম-বিকশিত চেতনা লক্ষ্য করিলেন; পৃথিবীর সর্বত্র গণ-জাগরণের পরিণতি তাঁহাদের চোখে পড়িল। নেতারা স্পষ্টই বুঝিলেন, এই জোয়ারের মুখে কংগ্রেস পড়িলে তাঁহাদের নেতৃত্ব ভাসিয়া যাইবে; কংগ্রেস হয়ত একেবারে অকূলে দিশাহারা হইয়া ডুবিবে; হয়ত মহাসমুদ্রের বিপুল তরঙ্গ চূড়ায় ডুবিয়া ভাসিয়া যেখানে গিয়া উঠিবে সেখানে আর উহার পূর্বতন রূপের চিহ্নও থাকিবে না—এক গণ-সঙ্ঘ বা শ্রেণী-নিবদ্ধ শ্রমিক-কিষাণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কংগ্রেস মিলাইয়া যাইবে। অতএব কংগ্রেস-নেতৃত্বের পক্ষে আত্মরক্ষার উপায় একদিকে গণ-বিপ্লবের গতিরোধ করা অন্যদিকে বিদেশীয়দের হাত হইতে নিজ হাতে রাজ্য-শাসন গ্রহণ করা। সেই শাসন-ভার আয়ত্ত করিবার জন্য তাই কংগ্রেস-নেতৃত্ব গণশক্তি প্রয়োগ করিতে চাহেন না, অর্থাৎ ব্যাপক কোনো গণ-আন্দোলনই প্রবর্তন করিতে পারেন না। কারণ, দুয়ার একবার খুলিয়া দিলে হয়ত ব্যাপক সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া বিপুলতর "গণাগ্রহ" ঢুকুল ছাপাইয়া উঠিবে—স্পষ্টই শ্রমিক ও কিষান নেতারা তাহা বলিতেছেন। তাহাতে শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যের বণিক-শাসনই যে লোপ পাইবে তাহা নয়, গুয়ার্ধা বোম্বাইর ভারতীয় ও জাতীয়তাবাদী বণিক সমাজও তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবে। অতএব অহিংসা, গণতন্ত্র, আভ্যন্তরীণ শান্তি, চরকা, গ্রাম-উদ্যোগ প্রভৃতির শিকল আঁটিয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব দুয়ার বন্ধ করিয়া রহিল। অথচ, ভারতীয়-স্বদেশীর পক্ষে এত বড় সুযোগ আর নাই; তাই কি করিয়া ক্ষমতা আয়ত্ত করা যায়, তাহারও পথ কংগ্রেস নেতারা হাতড়াইয়া ফিরিতে লাগিলেন। গণ-সংগ্রাম যখন পরিত্যক্ত হইল, তখন এদিকে হয় পথ থাকে—সহযোগিতা বা আপোষ রফার, নয় অসহযোগিতা বা চাপ দিয়া ক্রমশ ক্ষমতা আয়ত্ত (Politics of stalemate and concession "pr essure politics," করার। দুর্ভাগ্যক্রমে বহুদিনের অভিজ্ঞতায় কংগ্রেস নেতারা বুঝিয়াছেন। সহযোগিতার পথে বৃটেনের নিকট

কিছুই লাভ করা অসম্ভব। তাই, তাঁহাদের সমালোচকবৃন্দ যাহাই বলুন, আপোষ করিয়া (Compromise) নিজেদের ভবিষ্যৎ আশা ও মান খোয়াইতে তাহারা কোনও সময়েই রাজী ছিলেন না। অপরপক্ষে গণ-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইবেন না, ইহাও তাঁহাদের একরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প। যে সংগ্রাম তাঁহাদের মনঃপূত সে সংগ্রামের নাম—চাপ-দেওয়া, ব্যাপকবিরোধিতা নয়; প্রতিবাদ (Protest), বিরুদ্ধাচরণ (challenge) নয়; বিদেশীয় শাসন চূর্ণ করা নয়, অচল অবস্থার সৃষ্টি করা। তাহার উদ্দেশ্য—সংস্কার, ধীরে ধীরে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করা,—আমূল পরিবর্তন নয়, অগৌণ স্বাধীনতা নয়।

বর্ত্তমান নীতির অর্থ

বিত্তবানের রাজনীতি এইরূপই হইতে পারে,—দেশবিদেশে বিত্তবানদের সঙ্কট উপলব্ধি করিয়া আজ তাহারা আর গণ-সংগ্রামের পথ গ্রহণ করিতে পারে না। এই দিক হইতে ইহাদের গণনায় ভুল হয় নাই। ভারতীয় জনশক্তি কতদূর সংগঠিত তাহা ইহারা জানে না। সেই শক্তি শেষ স্তরে কতদূর তাহাদের সহায়ক হইবে, সে বিষয়েও তাহাদের সন্দেহ আছে। অতএব, এইরূপ শক্তিকে উদ্বোধিত করা তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক—হয়ত একুল ওকুল, দুকুল যাইবে: যেমন, (১) ব্রিটেনের বিরোধিতা করিয়া পরাহত হইলে যেটুকু ক্ষমতা এখন (ভারতীয় শাসন আইনে) তাহারা লাভ করিয়াছে, তাহাও তাহারা হারাইবে। (২) আবার ব্রিটেন যদি জার্মান যুদ্ধে পরাহত হয়, ভারতীয় বুর্জ্জোয়াজির স্বপ্ন নাৎসি দাপটে মিলাইয়া যাইবে। (৩) ইহা ছাড়া, গণ-আন্দোলন করিলে প্রবল গণ-মন্থনের মধ্য দিয়া সাম্প্রদায়িক ও নানা বিশৃঙ্খলাও দেশ জুড়িয়া বসিতে পারে। মোটের উপর, এই সব বিপদকে এড়াইয়া বিচক্ষণতার সহিত যাহা পাইয়াছি তাহাই একটা অহিংস অসহযোগের শান্ত স্থির উপায়ে বাড়াইয়া তুলি—ইহাই এখনকার কংগ্রেস পলিটিক্স্। সংগ্রাম যখন নানা কারণেই অসম্ভব, তখন সমস্ত প্রশ্নটিকে নৈতিক আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করিয়া তুলিলে, পৃথিবীর দরবারে আমাদের কথা বলিবার মত যথেষ্ট সুবিধা হয়। সেই দিক হইতে দুই দশ জন গান্ধী বা জওহরলালের বা নামকাটা মন্ত্রীর সত্যাগ্রহই যথেষ্ট। কারণ, ব্রিটেনের বড় একটি কাজই হইল এই দরবারে নিজেকে ন্যায়ের পক্ষ বলিয়া প্রমাণিত করা। আমরাও তাই সেখানে বলিতে পারিব, "এই তো ভারতবর্ষ চাহিতেছে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা,—ব্রিটেন কোন্ ন্যায়-বলে তাহা অস্বীকার করিতেছে? গান্ধীজী জেলে, জওহরলাল জেলে, মন্ত্রিবর রাজাজী জেলে,—ব্রিটেনের পক্ষে পৃথিবীতে কি আর মুখ দেখানো চলে?" নিরস্ত্র, সংগ্রাম-অক্ষম

ভারতের পক্ষে এই নৈতিক উপায়ে ক্ষমতা আয়ত্তের চেষ্টা মোটের উপর বুদ্ধিরই লক্ষণ। যদি ক্ষমতা এখনও আয়ত্ত না হয় যুদ্ধান্তে বলিতে পারিব, "তোমাদের যুদ্ধকালে বিড়ম্বিত করি নাই—এমন কি স্বাধীনতার দাবী পর্য্যন্ত চাপা রাখিয়াছি।"

এই রাজনৈতিক গণনায় ভুল বেশি নাই—যাহা আছে তাহা এই: প্রথমত পৃথিবীর দরবার বলিতে আজ বড় জোর আমেরিকা বুঝায়—কিন্তু সেও আর নিরপেক্ষ দরবার থাকিবে না। দ্বিতীয়ত, "নৈতিক চাপে" কাজ হয় তখন যখন মানুষের জীবন-যাত্রা সুস্থির গতিতে চলে। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জীবনই বিপন্ন; 'নৈতিক প্রশ্ন' লইয়া বিচার করিবার সময় নাই। তৃতীয়ত, এই সমস্ত গণনার মূলে আছে একটি অবিচলিত আশা, ব্রিটেন জিতিবেই জিতিবে। কিন্তু ব্রিটেন নিজেও এখন পর্য্যন্ত এবিষয়ে এত নিশ্চিত নহে।

বিবাদী জাতীয়তাবাদ

এই গণনা ও এই হিসাবের প্রত্যুত্তর রূপেই আমাদের পলিটিক্সে ফরওয়ার্ড ব্লকের আবির্ভাব ঘটে। মুখ্যত উহার নীতি উহার নেতার নীতি। সুভাষচন্দ্র ব্রিটেনের বিজয়ে বিশ্বাসী নহেন। এবং বিজয়ী ব্রিটেন যে ভারতবর্ষকে কিছুই দিবে না, এই বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। অতএব, কিছু লাভ করিতে হইলে সংগ্রামের পথে চলিতে হইবে, এবং সংগ্রামের সুযোগ এখনই। তাই, সংগ্রাম-শঙ্কিত গান্ধী-নেতৃত্বের সহিত তাঁহার বিরোধ স্পষ্ট।

মোটের উপর কংগ্রেস-নেতৃত্বের প্রতিপক্ষ হিসাবেই সুভাষচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাহার নীতিও তেমনি পাল্টা নীতি হিসাবেই উপস্থিত করিয়াছেন। উহার অপাত-বৈষম্য ও স্বয়ং বিরোধিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া বলা যাইতে পারে, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-নেতৃত্বকে সংগ্রাম-মুখীন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী-ধারাকেও তাই তিনি পুষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। এই হিসাবেই তিনিও বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বের অবসান কামী,—এইখানেই তাঁহার সহিত গণকর্ম্মীদের সংযোগ ও সহযোগিতা। কিন্তু তাঁহার নিজস্ব স্থান ইহাদের সহিত নয়, ইহাদের মধ্যে নয়। এই কথাটিই ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল ঘটনার বিকাশে ও পলিটিক্সের বিপর্যয়ে।

সুভাষচন্দ্র ভারতীয় রাজনীতিতে মূল কংগ্রেসের নেতাদের প্রতিপক্ষ বটেন, কিন্তু তিনিও মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রতিভূ। শুধু প্রতিভূ নহেন, যোগ্যতম প্রতিভূ। বাস্তববুদ্ধিতে, কর্ম্মতৎপরতায়, নিঃসঙ্কোচ কুণ্ঠাহীনতায় তিনি যেভাবে অগ্রসর হইতে

পারেন সেইরূপ শক্তি ভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের অন্য কাহারও নাই। তাঁহার শক্তি অসাধারণ, নিজ শক্তিতে তাঁহার আস্থাও অপরিসীম। এই কারণেই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত স্বকেন্দ্রিক। তিনি রাষ্ট্র ক্ষেত্রের শক্তিগুলিকে তাহাদের শ্রেণীভিত্তির বা আর্থিক মূলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখেন না। তাই, তিনি বিবেচনা করেন—ব্যক্তিগত লাভের পরিমাপ নিয়মিত করিয়া ফেলিলে শ্রেণীভেদাত্মক ফ্যাশিজম্ ও শ্রেণী-উচ্ছেদকামী সাম্যবাদেও সমন্বয়-সাধন করা যাইবে। স্থকৌশলী নেতৃত্বের পক্ষে তাই গণ-শক্তিকে সাময়িক ও কালোপযোগী মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া সম্ভব; বিচক্ষণতার দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত ও চালিত করাও কঠিন নয়। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ইহা মনে করিবার কারণ তাঁহার দেশ-বিদেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা—যে অভিজ্ঞতা চিত্তরঞ্জন ও গান্ধীজীর নিকট হইতে সঞ্চিত; যে অভিজ্ঞতা ডি ভ্যালেরা, মুসোলিনী ও শেষ-দিকে ভিয়েনা-বাস কালে হিট্‌লরীয়দের নিকট হইতে সংগৃহীত। সমাজের বিকাশ—শ্রেণী বিরোধের পথে নয়, বঞ্চিত-শ্রেণী শুধুমাত্র শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণীচেতনার দ্বারা চালিত হয় না;—ডি ভ্যালেরা হইতে হিট্‌লর পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনায়কগণ এই তত্ত্বই পৃথিবীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রও মনে করেন বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থকে একটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামশীলতার মধ্যে একত্র করা ও একত্র রাখা সুসম্ভব আর তাহাই Realpolitik বা পলিটিক্যাল বাস্তব বুদ্ধির কাজ। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাই ভারতীয় সমস্ত জন-সমাজের মুখ্য ও গভীরতম আবেগ (motive power); বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ সে আবেগের গৌণ পরিপোষক-মাত্র। অতএব, সেই মূল আবেগটিকে গভীর ও কার্য্যকরী করিবার চেষ্টায় বাস্তব-রাজনীতিজ্ঞ সময় ও সুবিধামত আপনার পথ নির্বাচিত ও পরিবর্তিত করিবে—মতাদর্শ (ideology) বা কর্ম্মধারা (programme) লইয়া বিচার-বিতর্ক নিতান্তই পুঁথিগত (bookish) পলিটিসিয়ান্‌দের কাজ।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সমস্ত রূপ ও কর্ম্মধারায় এই মত ও ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। বৈদেশিক নীতিতে উহার কোনো আদর্শঘটিত অসুবিধা হয় নাই। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে-কোনো শক্তিকেই উহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বন্ধু হিসাবে জ্ঞান করিতে পারে—ডি ভ্যালেরা, মুসোলিনী, জার্মানি, জাপান, এমন কি সাম্যবাদী সোভিয়েৎ পর্য্যন্ত। দেশীয় নীতিতেও ইহা যে কোনো রাজনৈতিক উপদলকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে; তাহাদের শ্রেণী-ভিত্তি, মতাদর্শ, কর্ম্মসূচী লইয়া পরস্পরে বিরোধিতা থাকিলেও যায় আসে না। শুধু দেখিতে হইবে সুবিধা যেন হাত ছাড়া না হয়, শক্তি আয়ত্তের কেন্দ্রগুলি যেন দখলে আসে।

ইতিহাসে এই রাষ্ট্রদর্শনের স্বপক্ষে যে জলন্ত সাক্ষ্য রহিয়াছে তাহা একবার স্মরণ করা উচিত। রাজনীতিমাত্রই এইরূপ Realpolitik—ইহাই কাভুর-বিসমার্কের পথ; ইহাই ডি ভ্যালেরা-পিলসুডস্কির পথ; ইহাই ম্যাসেরিক-বেনেসের পথ। আবার উচ্চতর স্তরে উঠিলে ইহাই আক্‌সিসের পথও। মতাদর্শ (idealogy) ও কর্ম্মধারা (programme) লইয়া মাতামতি—অর্থাৎ শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণী-ভিত্তি লইয়া গবেষণা বা বৃহত্তর মানবাদর্শের সুপ্রশস্ত অবকাশ—এই সব ইহাতে নাই—থাকিতে পারে না। সত্য কথা বলিতে গেলে, ভারতীয় কংগ্রেসের শ্রীরাজগোপাল-শ্রীবল্লভভাই প্রমুখও এই নীতির দ্বারাই চালিত। কিন্তু দৃষ্টি তাঁহাদের ঘোলাটে, চেষ্টা তাহাদের অনিশ্চিত, আর কংগ্রেসের ভার তাঁহাদের উপর বলিয়া ভারতীয় বুর্জোয়াজির পলিটিক পরিচালন ভারও তাঁহাদের উপর, তাই বুর্জোয়াজির দ্বন্দ্বগ্রস্ত সংস্কার নীতিই তাঁহাদেরও নীতি। অপরপক্ষে ভারতীয় পূর্ব উপকূলের বেকারগ্রস্ত পেটি বুর্জোয়াজির মুখপাত্র হিসাবে সুভাষচন্দ্রের নীতি সংগ্রামাত্মক, কিন্তু গণ-বিপ্লবের বা শ্রেণী-বিপ্লবের নীতি নয়; আর দৃষ্টি তাঁহার অভিজ্ঞতায় শাণিত, চেষ্টা তাঁহার প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তনীয়।

ফরওয়ার্ড ব্লকের এই রাজনীতির মধ্যে অস্পষ্টতা কিছুই নাই—আছে অসামঞ্জস্য। তাহাই ইহার কর্ম্মধারায় ক্রমশ বাহির হইয়া পড়ে। উহার মধ্যে বিভিন্ন দল আছে, বিভিন্ন মত আছে। আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই লোক সুবিধামত বিভিন্ন উক্তি করিতে পারে আবার কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধিতা করিতে গিয়া ইহা ক্রমশই, বিশেষ করিয়া রামগড়ের আপোস বিরোধী সম্মেলনের পরে, 'কংগ্রেস-বিরোধী' বলিয়া ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশীয়দের চক্ষে প্রতীয়মান হয়। এই কারণেই ইহার পরিচালক শ্রেণীর নিকট আমরা এত পরস্পর বিরোধী মত কথা শুনিতে পাই। কিন্তু এই বিরোধ ইহার চাপা পড়িতে পারিত মাত্র একটি উপায়ে যদি সত্যই ইহা কোনো সংগ্রাম আরম্ভ করিতে পারিত। বাংলা দেশে হল্‌ওয়েল মনুমেন্টের ব্যাপারে সেই চেষ্টা হইয়াছে। উহার যতটুকু ফললাভ করিবার তাহা লাভ হইয়াছেও। কিন্তু ব্যাপারটার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, সংগ্রাম পদ্ধতিতেও পুরাতন গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহের পথই গ্রহণ করিতে হয়। বাংলার ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্ন ও রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন ইহার চেয়ে গুরুতর ছিল। তাহা ছাড়া, রামগড়ে "জাতীয় সংগ্রাম" তূর্য্যনিনাদে বিঘোষিত হয়। অথচ একমাত্র বিহারে ছাড়া উহার কোনো ব্যাপক প্রয়োগের চেষ্টাও অন্যত্র লক্ষিত হইল না; বরং সেই 'জাতীয় সংগ্রাম' ঘোষণার পরে সময় গেল কর্পোরেশন্, মন্ত্রিত্ব-জল্পনা প্রভৃতিতে। হয়ত কৌশলের দিক হইতে এই কালক্ষেপের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সংগ্রাম-মুখীন যে জনচিত্ত

কংগ্রেসের গান্ধী-নেতৃত্বে নিরাশ হইয়া প্রতিযোগী নেতৃত্বকে স্বাগত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাহা এই জন্যই ক্রমশ হতাশ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। একমাত্র নাগপুরের রুইকর ছাড়া এই নূতন নেতৃত্ব কোনও একটি গণ-সংগ্রামেরই আয়োজন বা পরিচালন ভার গ্রহণ করিতে পারিল না। শেষ পর্য্যন্ত যে গতিবেগ (dynamism) ইহার লক্ষণ ছিল শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপস্থিতিতে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলের মধ্যে তাহার তাড়নাও দুর্লভ হইল। বিবৃতিমার্গে আজ তাই অলীক ও বিরোধী কথাই ঘোষণা করিতে হয়, "আমরা কংগ্রেসের আপোষের পথ বন্ধ করিয়াছি"; আবার, "খণ্ড যুদ্ধ আজ আমরা জাতীয় যুদ্ধে পরিণত করিয়াছি।"

কংগ্রেস না কংগ্রেসের বিরোধিতা, মন্ত্রিত্ব না সংগ্রাম, সংগ্রাম না দলগত সংগঠন, নিজস্ব প্রয়াস না আন্তর্জাতিক দৈবফল, সত্যাগ্রহ না গণ-আন্দোলন, ছাত্র-যুবক-মুখ না গণ-শক্তি, এইসব বহু দিকের বিরোধী টানে ফরওয়ার্ড ব্লক যে পথ স্থির করিতে পারে না, তাহার কারণ ফরওয়ার্ড ব্লক জনগণের দল নয়; উহা ভারতীয় নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের মুখপাত্র। এই নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ আজ ভাগ্য প্রপীড়িত, বেকার, সর্বত্র বঞ্চিত। তাই, আশা করা গিয়াছিল যে, নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষার সহায়ে তাহারাই ভারতীয় সকল বঞ্চিত শ্রেণীর—শ্রমিক ও কিষানেরও সম্মিলিত সংগ্রাম চালাইবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল মধ্যবিত্তের চেষ্টা উচ্চারোহণে; তাহারা তাই গণ-স্বার্থ গ্রহণ করতে পারে না। তাই, মধ্যবিত্ত চিরদিনই মধ্যখানে দোলা খায়—এমন কি শেষ পর্য্যন্ত গ্রহণ করে ফ্যাশিজম্। নিম্ন মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবাদ মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদের একটি অংশ মাত্র। বামপন্থী জাতীয়তাবাদ যে দিশাহারা হইয়া গেল তাহার কারণ এই যে—(১) আদর্শের দিক হইতে পোল্যাণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্যলিপি পাঠ করিয়া মানবেতিহাসে জাতীয়-স্বার্থান্বেষী রাজনীতির পরিণাম সম্বন্ধে মানুষ আজ হয় ত্রাসগ্রস্ত নয় সংশয়াকুল—নিছক জাতীয়তাবাদ ও আজ পূর্ণ আদর্শ বলিয়া তাই আর স্বীকৃত হয় না। (২) পৃথিবীব্যাপী শ্রেণী-বিভেদ স্পষ্টতর হইয়া উঠায় আমাদের দেশেও তাহার সেই ভেদ-রেখা দেখা দিয়াছে, এবং (৩) মধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া জনগণ আপন নেতৃত্ব গঠনে চেষ্টাশীল হইয়াছে। অন্যদিকে (৪) ভারতীয় রাজনীতির শিক্ষা এই যে, যদি সংগ্রামের পথই গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে সত্যাগ্রহের পথ ছাড়িয়া হয় গ্রহণ করিতে হইবে সহযোগিতার পথ, নয় গণ-আন্দোলনের পথ।

বলা বাহুল্য, মধ্যবিত্তের স্বাধীনতা-আন্দোলন অগ্রসর হইতে হইতে অকস্মাৎ যখন এই সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া পড়িল তখন উহা একেবারে ফিরিয়া যাইতেও পারে

না অগ্রসর হইয়া যাইতেও পারে না—এমনি অবস্থায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান কংগ্রেসের অবস্থা—তাহার অভ্যন্তরস্থ বিবদমান বামপন্থী জাতীয়তাবাদের ও দক্ষিণ পন্থী জাতীয়তাবাদের সমস্যা।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় এই যে, ইহাদের বাধাকে অতিক্রম করিয়া কংগ্রেসের ভিতরে বা বাহিরে আপনাদের পথ করিয়া লইবে, ভারতীয় জনগণ সেইরূপ সংগঠন ও নেতৃত্ব এখনও গঠন করিতে পারে নাই। পৃথিবীর ঘটনা বিপর্য্যয়ে দেশে আর্থিক বিপর্য্যয় না ঘটিলে এখন তাহা পারিবেও না। অবিলম্বে এই নেতৃত্ব ও এই সংগঠন গঠনই তাহাদের দায়িত্ব।

বর্ত্তমানের দৃষ্টি ক্ষেত্র হইতে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। বরং বর্ত্তমান যতই নৈরাশ্যজনক হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় ততই সান্ত্বনা খুঁজিবার ঝোঁক বাড়ে। সে ঝোঁক প্রত্যেকের ব্যক্তি ও দলগত আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীই হয়। অতএব ভবিষ্যতের বিষয়ে ভাবিয়া লাভ নাই। বিশেষত, আজ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এতই অনিশ্চিত, মানুষের ভবিষ্যৎ একদিকে অ্যাংলো-আমেরিকান্ উদার-নৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, অন্যদিকে ফ্যাসিস্ত-নাৎসি-জাপ নায়কতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তৃতীয়দিকে শ্রেণীহীন শোষণহীন সোভিয়েৎবাদের মধ্যে এমনি দোলা খাইতেছে যে, ইতিহাস আমাদের এই দ্বিধা-জড়িত ভারতীয় কংগ্রেস, তাহার দুর্ব্বল বিত্তবান বা মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনীতি, মতামত, এমন কি, ভারতের আর্থিক-সামাজিক বিকাশেরও তোয়াক্কা না রাখিয়া এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ফেলিতে পারে। সন্দেহ মাত্র নাই—যতই না আমরা একই গান্ধীকেন্দ্রে ঘুরপাক খাই—পৃথিবীর কেন্দ্রচ্যুতি ঘটিয়াছে,—আমাদের চলা-বলার হিসাব হয়ত আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে আর কাজেও লাগিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানের এই সজীব সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করিবার হেতু নাই যে, ভারতীয় সমাজ শ্রেণী সমস্যায় সচেতন হইয়া উঠায় বাম ও দক্ষিণ পন্থী ভারতীয় জাতীয়বাদ আজ গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক, আর তাই কংগ্রেস তাহার গণ-মুখীনতা, তাহার সংগ্রামশীলতা ও তাহার পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতের এই বিত্তবান্ ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

ইহাই ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর শেষ দান—কংগ্রেসকে সীমাবদ্ধ করিয়া আনা। এই প্রয়াসে "কংগ্রেস ভবন" এক দুর্ভেদ্য বণিক-প্রাসাদে পরিণত হইবে। সেই 'ক্ষুধিত পাষাণের' চারিদিকে সুভাষচন্দ্র কি তখন পাগলা মেহের আলীর মত চীৎকার করিয়া ফিরিবেন—"সব ঝুটা হ্যায়?" আর এলাহাবাদের

"আনন্দ ভবনের" রোম্যান্টিক পণ্ডিত কি অধীর আগ্রহে তাহার অভ্যন্তরের কক্ষতলে দ্বার হইতে দ্বারে আপনার কল্পনালোকের সেই আদর্শের অভিসারে তখন স্বপ্ন সঞ্চয়ন করিয়া বেড়াইবেন ?

পুনশ্চঃ—উপরের প্রবন্ধটি লেখার পরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে; কতকাংশে ইহা ব্যাপকও হইয়াছে। কংগ্রেস সদস্যমাত্রই এই ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও কংগ্রেসের শৃঙ্খলা স্বীকার করিয়া এই আন্দোলনে যোগদান করিবেন, করা কর্ত্তব্যও হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আন্দোলনের স্বরূপ ভুল করা উচিত নয়;—ইহা প্রতিবাদ (Protest) মাত্র, বিপক্ষাচরণ (challenge) নয়; ইহার উদ্দেশ্য নৈতিক;—ব্রিটিশের ও পৃথিবীর দরবারে আমাদের আপত্তি জ্ঞাপন; ইহার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক;—পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, কংগ্রেসের যুদ্ধ বিষয়ে অহিংসাবাদও নিজ মতবাদ প্রচারে স্বাধীনতা লাভ। তথাপি ইহার যে রাজনীতিক দিক আছে এবং সক্রিয় কার্যপদ্ধতি হিসাবে ইহা যে মূল্যবান্, তাহা স্বীকার্য। ইহার মধ্য দিয়া গণ-নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ হয়ত মিলিবে না, কিন্তু কংগ্রেসের নৈতিক ও রাজনৈতিক সম্মান রক্ষিত হইবে এবং উহার পার্লায়ামেণ্টরী নেতৃশাখার (মন্ত্রী, সদস্য প্রভৃতিদের) অতীত অপবাদ ক্ষালিত হইবে।—লেখক।

কবি সুকুমার রায়চৌধুরী

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

সরু দেওয়ালের উপর হাম্‌টি ডাম্‌টি বসিয়াছিল, এমন সময় এলিসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ। চট্‌ করিয়া সে চটিয়া উঠে, বেচারী এলিস তাহার মেজাজের কুলকিনারা পায় না। এমনি করিয়া খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর হাম্‌টি ডাম্‌টির সহিত তর্কপ্রসঙ্গে এলিস যখন বলিল, "But 'glory' does not mean 'a nice knock down argument",' হাম্‌টি ডাম্‌টি অবজ্ঞাজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিল, "When *I* use a word, it means just what I choose it to mean—neither more nor less"। বহু নিরঙ্কুশ কবি হাম্‌টি ডাম্‌টিকে অদ্বিতীয় সমালোচক বলিয়া মানিয়া লইবেন; কারণ তাঁহাদের কবিতার অর্থ নিজেদের কাছে সুস্পষ্ট হইলেও বহু হাঁদা পাঠক নাকি একেবারেই বুঝিতে পারে না। তবে হাম্‌টি ডাম্‌টির কথা কি শুধুই হেঁয়ালি ? কাব্যে শব্দের যে অর্থ তাহাকে অভিধানে খুঁজিয়া ত' পাওয়া যায় না। কবি মাত্রেরই স্পর্দ্ধা যে কাব্যে শব্দের অর্থ ততটুকুই যতটুকু কবি সে শব্দকে বহন করাইতে চায়। তবে চাহিলেই পাওয়া যায় না; তাই কবির ভাগ্যে এতখানি গৌরব কদাচ জুটে। অভিধানের শব্দ, ব্যবহারিক জগতের শব্দ, কড়াক্রান্তি হিসাবের শব্দ সব মরা। তাহাদের জীয়াইয়া তোলা বড় সোজা কর্ম্ম নয়। শব লইয়া চালাকি করিতে গেলেই শবসিদ্ধ হওয়া যায় না। দুষ্ট ভূত ঘাড়ে চাপে; শব শবই থাকিয়া যায়, মাঝে হইতে বেতালের দৌরাত্ম্যে অন্য সকলে অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে।

হাম্‌টি ডাম্‌টির হেঁয়ালি এলিস বুঝিতে পারে নাই। তাই সে অবাক হইয়া ভাবিল, এক কথার এত রকম মানে হয় কেমন করিয়া। বিজ্ঞপ্রবর হাম্‌টি ডাম্‌টি উত্তরে লাখ কথার এক কথা বলিয়াছিল, "The question is, which is to be master—that's all"। বাস্‌! এই শেষ কথা। সব কবির পক্ষেই এ কথা খাটে, বিশেষ করিয়া আবোল তাবোলের কবির পক্ষে এ যুক্তি অপরিহার্য্য। যে কাব্য তর্ক ও যুক্তির বন্ধন মানিয়া লয়, তাহার পক্ষে শব্দব্যবহারে শৈথিল্য তত মারাত্মক নয়। কারণ সূক্ষ্ম অনুভব, প্রাণবান মনন, সুকুমার চিত্তবৃত্তি এই সব গুণ দু একটি নির্জ্জীব শব্দ বা শিথিল চরণের দোষ সহজেই স্খলন করিতে পারে। কিন্তু যে কবি তর্কগ্রাহ্য বুদ্ধির জীবনকে স্বেচ্ছায় পরিহার করিয়াছেন, তাঁহাকে শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকিতেই হইবে। অবশ্য কাব্যের প্রতিপাদ্য কাব্য ছাড়া আর কিছু

নয়; তবু কাব্যে যে অভিজ্ঞতা রূপময় হইয়া উঠে তাহা বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া যায় না। যাহা সঙ্গতির পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহাতে ধ্বনির অসঙ্গতি মারাত্মক নয়, প্রমাদ মাত্র। কিন্তু অসঙ্গতিই যাহার প্রাণ, ধ্বনির সম্পূর্ণ সঙ্গতি সেখানে অপরিহার্য্য। এই সঙ্গতির এতটুকু বিপর্য্যয় ঘটিলেই নিরর্থক কাব্য অনর্থ ঘটায়,প্রলাপের পর্য্যায়ে আসিয়া নামে। দৃষ্টান্ত না দিলেও চলে। শুধু স্মরণ করিলেই হয় ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যে শব্দ-ব্যবহারে অসঙ্গতি আমাদের উপভোগ কতটুকুই বা ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু 'খেয়াল রসের' কবির পক্ষে চিলিমি প্রশ্রয় দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। 'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব' তাহাকে লইয়া কাব্য রচনা করিতে গেলে একটিও অসংলগ্ন চিন্তা, একটিও উদ্ভট যুক্তি, একটিও অসম্ভব মিল একেবারেই অচল। এই পৃথিবী 'নিয়ম-হারা', 'বেয়াড়া' এবং 'সৃষ্টিছাড়া' হইতে পারে; কিন্তু ইহার প্রকাশের 'আজগুবি চাল' বেতাল ত নহেই, বেঠিকও নয়। ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে সুপরিচিত লিয়র রচিত 'The Jumblies' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। ম্যাকবেথের ডাইনি বুড়ীর একটি কথা অবলম্বন করিয়া লিয়র এই অপূর্ব্ব কবিতাটি রচনা করেন। ম্যাকবেথ নাটকটির পরিবেশের সঙ্গে "In a sieve will I thither sail" সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায় নাই বলিয়াই এই লাইনটিকে সহজে গ্রহণ করিতে আমাদের সঙ্কোচ বাধে। কিন্তু লিয়রের কল্পনা সমস্ত নীতিবোধকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া এমন এক রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে যেখানে অত্যন্ত অসম্ভব হইলেও এই জাম্বুলিদের চালুনিতে চড়িয়া সমুদ্র অভিযানের বৃত্তান্ত আমাদের মুগ্ধ করে। সবুজ মাথা ও নীল হাতওয়ালা এই বালখিল্যদের চালুনি চড়িয়া সমুদ্র পাড়ি দেওয়া অসম্ভব হইলেও লিয়র যে পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন সেখানে এইরূপ ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক, এত স্বাভাবিক যে এই প্রাণীদের কি হইল ভাবিতে আমাদের উৎকণ্ঠা হয় এবং দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পর যখন জাম্বুলিরা ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে কত অদ্ভুত জিনিষ, তখন আমরা অত্যন্ত উল্লসিত বোধ করি। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে নিতান্ত নিরর্থক হইলেও এই কাহিনীতে অসঙ্গত কিছুই নাই। হোক না মানুষের সবুজ মাথা, নীল হাত। জাহাজ হোক না চালুনি; মাস্তুল পাইপ, এবং ছোট ন্যাকড়া জাহাজের পাল। হিসাব করিলে দেখা যাইবে বেঠিক কিছুই নাই। সব অত্যন্ত সঙ্গত; কবিতার শেষে যুক্তিডের রীতিতে Q. E. D. লেখা চলিত। তাই জাম্বুলিদের জন্য আমরা উদ্বিগ্ন হই। তাই ত! অত জোরে সমুদ্রে জাহাজ ছোটান ত নিরাপদ নয়।

"And every one said, who saw them go
'O won't they be soon upset, you know!

For the sky is dark, and the voyage is long.
And happen what may, it's extremely wrong
In a sieve to sail so fast!"

অর্থ নাই। নাই বা থাকিল। আমাদের উপভোগের কোনও বাধা ত ঘটে না। স্বেচ্ছায় অবিশ্বাস করিতে প্রতিনিবৃত্ত হই; আর্টের উপভোগের জন্য তাহাই যথেষ্ট।

সুকুমার রায়চৌধুরীর কল্পনা এই আজগুবি আজবপণার রাজ্যে বিস্তৃতি প্রসারিত করিয়াছিল। লিয়র এবং লুইস ক্যারলের ন্যায় তিনিও আবোল তাবোলের কবি। বালকদের কল্পনাকে কিরূপে তিনি সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাহার বিচার করিতে গেলে অনেক দিনের পুরানো স্মৃতিতে নির্ভর করিতে হয়। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দূর শৈলশিরে প্রত্যেক মাসের প্রথমে কোন্ বালকের অধীর প্রতীক্ষার কথা আজও স্মরণ হয়। এই লোভের সবটুকুই অবশ্য মানসিক ছিল না। শৈশবে শরীর অত্যন্ত রুগ্ন থাকায় অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ দাদামহাশয় বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও আমার ভাগ্যে তাঁহাকে 'সন্দেশের' মলাটের সন্দেশ-পরিবেশক 'দাদুর' মূর্ত্তিতে দেখিবার সৌভাগ্য জুটিত না। তা ছাড়া, 'সন্দেশের' পৃষ্ঠায় লুপ্ত জগতের যে সব অতিকায় বন্ধুদের আবিষ্কার করিলাম, সেই সব ডাইনোসর, ব্রণ্টোসোরস, টেরো-ড্যাক্‌টাইলদের সামনে পাথরের অস্ত্র হাতে লইয়া উপস্থিত হইবার স্পর্দ্ধা অর্জ্জন করিবার জন্য আমরা 'সন্দেশের' নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করিতাম। এই সব আজগুবি উদ্ভট জীব এক কালে বাস্তব ছিল মনে করিয়া আজগুবিতে আমাদের আনন্দ কায়েম হইত। সেই দিনে পিতা উপেন্দ্রকিশোর যখন প্রাগৈতিহাসিক বাস্তব আজবপণা দিয়া শিশুচিত্ত চমৎকৃত করিতেছিলেন, পুত্র সুকুমার আমাদেরই সুপরিচিত কলিকাতার গলিবিহারী গুলি ও লাট্টুপরায়ণ কলহমুখর বালকদের লইয়া যে পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন, সে পরিবেশ আমাদের কাছে এত প্রত্যক্ষ যে সময় সময় অবাক হইয়া ভাবিতাম আমাদের প্রাণের কথা এমন করিয়া লোকটি বুঝিল কেমন করিয়া। তখন কোন কোন কবিতা সবচেয়ে বেশী ভাল লাগিত ঠিক মনে নাই; কিন্তু "নারদ, নারদ" যে একটি, আজও তাহা স্পষ্ট মনে পড়ে। আজ বুঝিতে পারিয়াছি দুর্ব্বল দেহের জন্যই এই কবিতা পাঠে এত আনন্দ পাইতাম। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে গায়ের জোরে আঁটিয়া উঠিতে পারিতাম না বলিয়াই এবং সত্যই 'পিঠিয়ে ঝামা' করিবার মত বলশালী মামা ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় কল্পনায় ঘুঁসি উঁচাইয়াই অহঙ্কারের পরিতৃপ্তি হইত। সে যাহাই হোক, আজ মধ্য জীবনে পদার্পণ করিয়া যে সুকুমার রায়চৌধুরীর কাব্য উপভোগে মনকে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছি,

তাহার জন্য গৌরব বোধ করি। আজ 'আবোল তাবোলে'র প্রায় সব কবিতা কণ্ঠস্থ হইয়া আসিয়াছে; 'হযবরল'র কবিতাগুলি কত সময় আওড়াই। 'রামভজনের গিন্নি' যে কবিতায় রূপময়ী হইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে গৃহিণীর অভিমত কি, কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে, শুধু গৃহিণী কেন, লক্ষ্য করিয়াছি প্রৌঢ় ভদ্রলোকেরা প্রায়ই হযবরল'কে বরদাস্ত করিতে পারেন না। অমন মনোগ্রাহী বর্ণনাভঙ্গী, অমন যে ব্যা-করণ শিং বি-এ, যুক্তির অমন জ্যামিতিক প্রয়োগ তাঁহাদের মুগ্ধ করা দূরে থাক, সুকুমার রায় চৌধুরীর অনুরাগীদের তাঁহারা পাগল ভাবেন, ছেলেমানুষ বলেন। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সুকুমার রায়চৌধুরী যদি বাঙ্গালীসুলভ মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পান্‌সে প্রেমের বা খেলো নেচারবিলাসের কবি হইতেন, 'লাল গানে নীল সুরের' পরিবর্ত্তে যদি তাঁহার কাব্যে আদি-রিপুর ইঙ্গিত সুপরিস্ফুট হইত, জ্যোৎস্নার আলোকে লতাবেষ্টিত অলিন্দপথে দণ্ডায়মানা প্রেমিকাকে লক্ষ্য করিয়া হতবীর্য্য প্রেমিক যদি তাঁহার কবিতায় পেশাদারী অভিসার-সঙ্গীতও গাহিত, তাহা হইলেও হয়ত আমাদের বিকৃত কাব্য-বোধের কতকাংশে পরিতৃপ্তি মিলিত; আমরা তাঁহাকে কবি বলিয়া মানিয়া লইতাম। কিন্তু আজগুবির পরিমণ্ডলীর মধ্যে যে সুস্থ সবল পুরুষ মন লইয়া সুকুমার রায়চৌধুরী বালকদের চিত্ত জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভাব-বিলাসী বাঙ্গালীর কাছে সে মন খুব প্রিয় নয়। ক্লীব, পঙ্গু, উচ্ছ্বাসপ্রবণ, ভীরু, গতানুগতিক সমাজকে আবোল-তাবোলের ছন্দে ক্লাউনের ছদ্মবেশে তিনি যে নির্ম্মম কশাঘাত করিয়াছিলেন, তাহার সমঝদারি করিতে বাঙ্গালীর মন উন্মুখ নয়। তাঁহার শাণিত বিদ্রূপের পরুষ ও কঠোর আঘাত সহ্য করিতে প্রস্তুত নই বলিয়াই কি আমরা আবোল-তাবোলকে শিশু-পাঠ্য পুস্তকের তালিকাভুক্ত করিয়া নির্দ্দায় হই, এবং পুরস্কার-বিতরণী সভার সভাপতিরূপে একবার তাঁহার কাব্যগ্রন্থ হাতে করিয়াই তাঁহার প্রতিভার সম্যক মর্য্যাদা রক্ষা করিলাম ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করি?

সুকুমার রায় চৌধুরী 'ভুলের ভবে অসম্ভবের ছন্দেতে' যে কাব্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাহা 'খ্যাপার গান' নহে, মানে তাহার যথেষ্টই আছে, প্রত্যক্ষভাবে তাহা যতই অর্থহীন হোক না, এবং সুরের লালিত্য তাহাকে মুখ্যত কাব্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছে। সব গানই ত' খ্যাপার গান। গান বস্তুটিই খ্যাপামি বলিয়া জানিতেন বলিয়াই না খ্যাপা প্লেটো গীতময় গদ্যে কবি সম্প্রদায়কে তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্র হইতে নিষ্কাষিত করিয়াছিলেন। বেবাক লোক নাই যদি বোঝে, নাই বা বুঝিল। আবোল তাবোল না হয় পাগলই হইল, যদি তাহার মত্ত মাদলের ধ্বনিতে মন নৃত্যচপল হইয়া উঠে, তাহা হইলে অসম্ভবের ছন্দে যে ভুলের রাজ্য প্রাণবান হইয়া উঠিল, তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। এই

ভুলের রাজ্যকে স্বেচ্ছায় আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, যদি সে রাজ্যের অধিবাসী 'Jabberwocky'র মত আমাদের কল্পনাকে স্পর্শ করে। এলিস যখন কবিতাটি প্রথমে পড়ে অর্থ বুঝিতে পারে নাই, স্বীকার করিয়াছিল, "Somebody killed something: that's clear at any rate." পরে হাম্‌টি ডাম্‌টি এই কবিতাটির টিকা আরম্ভ করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহার ভাষ্য ছাড়াও কবিতাটি উপভোগ করা দুঃসাধ্য নয়।

" 'T was brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble at the wabe."

এই দুই লাইন বহু কাব্যামোদীকে আনন্দ দান করিয়াছে, যদিও তাঁহারা না জানিতে পারেন, 'Brillig' মানে "Four o'clock in the afternoon"। এই বিখ্যাত কবিতাতে লুইস ক্যারল বহু শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের অভিধানে খুঁজিয়া না পাওয়ার জন্য তিনি দায়ী নহেন। কে Bandersnatch এখনও ঠিক জানি না; কিন্তু সে যে 'frumious' ইহাতে কোনই সন্দেহ বোধ করি না, এবং যে প্রহরণে 'জ্যাবারওয়াকি' নিপাতিত হইল, তাহা এত বাস্তব যে তাহার নাম 'Vorpal blade' কেন হইল জিজ্ঞাসা করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। লিয়রও এই পন্থার অনুসরণ করিয়া কখনও কখনও অর্থহীন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'The Dong with a luminous nose' এ Gromboolian plain এইরূপ একটি নাম। 'The pobble who has no toes' এ 'tinkledy—binkledy—winkled a bell' এইরূপ শব্দ সৃষ্টি; তবে Mr. and Mrs. Spikky sparrow তে

Twikky wikky wikky wee
wikky bikky twikky tee

এই শব্দগুলি অর্থহীন হইলেও অর্থগৌরব অর্জ্জন করিতে পারে নাই, কারণ এগুলি অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপেই চড়াই পাখীর শব্দের অনুকৃতি। সুকুমার রায়চৌধুরী 'Jabberwocky'র অনুমোদিত পদ্ধতিতে অর্থহীন শব্দের সমষ্টি লইয়া খেলা করিতে তেমন প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়াই দু একটি উদ্ভট নাম, যেমন 'কুমড়োপটাশ' (হাম্‌টি ডাম্‌টির বাঙ্গালী ভাই), 'হট্টমূলোর গাছ', 'হুতোম-হাসি' 'আবোল তাবোলে' স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এলিসের কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত 'হযবরল'তে সুকুমার রায়চৌধুরী সম্পূর্ণ অর্থহীন শব্দ সৃষ্টিও করিয়াছেন এবং সে সব শব্দ অর্থগৌরবে গরীয়ান। হিজিবিজবিজ অনেক গান গাহিয়াছিল। প্রায় সবগুলিই চমৎকার। একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"বাদুড় বলে, 'পেঁচার কুটুম কুটুমী মানবে না কেউ তোমার এ সব ঘুঁতুমি। ঘুমোয় কি কেউ এমন ভুষো আঁধারে?—গিন্নী তোমার হোঁৎলা এবং হাঁদাড়ে। তুমিও দাদা হ'চ্ছ ক্রমে খ্যাপাটে চিম্‌নি-চাটা ভোঁপ্‌সা-মুখো ভ্যাঁপাটে।'" হিজিবিজিবের সহিত কুমড়োপটাশের সাক্ষাৎ হয় নাই, আক্ষেপের কথা হইলে কুমড়োপটাশকে সমালোচক রূপে আমরা দেখিতে পাইতাম। তাহা হইবার নয়। তবুও 'হোঁৎলা' মানে নিশ্চয়ই তোৎলা ও হোঁৎকা। ভোঁপসামুখো ভ্যাঁপাটে লোককে আমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাকে বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা আমাদের জুটিত না।

লিয়রের ন্যায় নিছক অর্থহীনতা সুকুমার রায়চৌধুরীর অভিপ্রেত ছিল না। আবোল তাবোলের রাজত্বে নিজের মনকে ছাড়িয়া দিলেও সুকুমার রায়চৌধুরী লুইস ক্যারলেরই ন্যায় শ্লেষপরায়ণ। ভিক্টোরীয় জীবনের বহু অসঙ্গতি ও বিচ্যুতি, বর্ব্বরতা ও হৃদয়হীনতা লুইস ক্যারলকে ব্যথিত করিয়াছিল বলিয়াই তিনি কল্পলোকে নিজের অপূর্ব বাসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। সোজা কথায় বলিলে অর্থ হয়ত সুস্পষ্ট নাও হইতে পারে, তাই এলিস হইয়া তিনি জীবনের মর্ম্মস্থলে পৌছিতে চাহিয়াছিলেন। আবোল তাবোলের কবিও স্বেচ্ছায় জীবনের সমালোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, বিজ্ঞ দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়া নয়, মুগ্ধ কবির সম্মোহন দিয়া নয়, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানপিপাসা দিয়াও নয়, বালকের বিশুদ্ধ কৌতূহলের দৃষ্টিতে। আমরা যখন ছোট থাকি, তখন আমাদের ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ নয়। কারণ, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমরা পদে পদে যে রফা করিতে বাধ্য হই, বালক সে রফার খোঁজ রাখে না। তাই, বালকের চিত্ত আমাদের চালাকির কসরৎ সব না বুঝিলেও আমোদ পায়, যে আমোদ পরিণত বয়সে আমরা উপভোগ করিতে পারি না। আমরা ভাবি আমরা খুব চালাক, আমাদের মেকি কার সাধ্য ধরে! কিন্তু বালক ঠিক বুঝিতে পারে কোনটুকু খাঁটি, কোনটুকু নয়। তবে, পরিণত বয়সের ভণ্ডামী বালকের সাধ্যায়ত্ত নয় বলিয়াই, অন্যের ভ্রমপ্রমাদ, ত্রুটিবিচ্যুতি অপরাধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়া নিজের বেলায় সেইগুলিকে চোখ ঠারিবার ভঙ্গী বালক জানে না। পরের দোষ সহ্য না করিতে পারা এত কিছু বাহাদুরী ত' নয়, তাই 'স্যাটায়ার' খুব স্থলিখিত হইলেও সহজে আমাদের মনকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুকুমার রায়চৌধুরী 'স্যাটায়ার' লেখেন নাই। কৌতূহলী হইয়া তিনি দেখিয়াছেন, মজা পাইয়াছেন, আমাদের সেই মজার ভাগ দিয়াছেন—কিন্তু আত্মবিস্মৃত হইয়া কণ্ঠনালী স্ফীত করিয়া তিনি চীৎকার করেন নাই। আঘাত করিয়াছেন বটে; সে আঘাত নির্ম্মমও বটে, কিন্তু আঘাত শাণিত লৌহের, ভোঁতা

কাঠের নয়। গলা পর্য্যন্ত কাটিয়া নামিয়া যায় হয়ত; কিন্তু এমন নিপুণ এবং ক্ষিপ্র তরবারিচালনা যে ব্যথা লাগিবার সময় পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

'আবোল-তাবোলে'র কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তাহা সুকুমার রায়চৌধুরীর বহুমুখী উৎসাহ। জীবনের কোনও স্তরকেই তিনি অবহেলা করেন নাই; সমগ্র জীবনের উপর দিয়া তাঁহার তীক্ষ্ণ ও মুগ্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়াছেন। যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই ভাল লাগিয়াছে এবং এই ভাল লাগার পথে যাহা কিছু অন্তরায় তাহাই তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছে, মুগ্ধ করিয়াছে, বিরক্ত করিয়াছে, ক্রুদ্ধও করিয়াছে। কিন্তু ক্রোধও তাঁহাকে দুর্বিনীত করিয়া তোলে নাই; তাই উষ্মা প্রকাশের সহজ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আবোল-তাবোলের পৃথিবীতে তিনি সুস্থ মন ও সহজ দৃষ্টি দিয়া জীবনের সমগ্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তৃপ্ত হইয়াছেন। 'খুড়োর কল', 'কুমড়োপটাশ' এবং 'ভূতুড়ে খেলা'য় নিরবচ্ছিন্ন খেয়ালকে পরিতৃপ্ত করিয়াই তিনি আনন্দ পাইয়াছেন। 'গোঁফচুরি' এবং 'গানের গুঁতোয়' তিনি ব্যক্তিগত দক্ষের মজা উপভোগ করিয়াছেন। 'কাঠবুড়ো', 'নোটবই' এবং 'নেড়া বেলতলায়' তিনি জীবন উপভোগে অক্ষম গ্রন্থবিলাসীদের শ্রমাক্ত নিঃস্বতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। 'লড়াই খ্যাপা'কে আমরা কতবার দেখিয়াছি; এবং কত 'বাবুরাম সাপুড়ে'কে যে আমরা কতবার অহিংস সাপ ধরিয়া দিতে বলিয়াছি তাহার হিসাব কে রাখিবে? ব্যক্তির দিকে তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। সকলকেই তিনি বেশ করিয়া দেখিয়াছিলেন। 'ও পাড়ার নন্দ গোঁসাই' যেদিন জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখাইতে গেল 'হুঁকো হাতে হাস্যমুখে', এবং ফিরিয়া আসিল 'শুষ্কনো সরু', সেদিন তাহাকে আমরাও দেখিয়াছি এবং অবাক হইয়া ভাবিয়াছি, কেন এমন হইল:

"বুড়ো আছে নেই কো হাসি হাতে তার নেই কো হুঁকো।"

খাসা লোক নন্দ খুড়ো! বেচারা হাত দেখাইয়াই কাজের বার হইয়া গেল! আর আমাদের প্যাচা। তাহাকে দেখি নাই কি?

"যত ভয় যত দুখ
দুরু দুরু ধুক্ ধুক্
তোর গানে পেঁচিরে
সব ভুলে গেছিরে,—"

পেঁচির গানে সব ভুলিতে না পারিলে প্যাচাদের কি দুর্দ্দশা হইত ভাবুন ত? নব-বিবাহিতরা অত্যন্ত আপত্তি করিবেন জানি; কিন্তু দাম্পত্য জীবনের এমন চমৎকার ব্যাখ্যা আর পাইয়াছেন কি?

'হেড অফিসের বড় বাবু' হইতে আরম্ভ করিয়া 'হাতুড়ে' ডাক্তার পর্য্যন্ত বহু বিভিন্ন প্রকারের ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই সুকুমার রায়চৌধুরী ক্ষান্ত হন নাই। 'সোনার বাংলা' এবং 'তীর্থবরদ বঙ্গের' অধিবাসী এমন কি শাসক সম্প্রদায় পর্য্যন্ত 'অসম্ভবের ছন্দেতে' রূপবান হইয়া উঠিয়াছে। এই দেশের অধিবাসীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মনোবৃত্তি সবই তাঁহার কাছে এত মজার ঠেকিয়াছে যে পরম বিশ্বাসী (কিসে বিশ্বাসী নাই বা জানা গেল) হইতে আরম্ভ করিয়া 'ট্যাশগরু' পর্য্যন্ত সমস্ত জীবেই তাঁহার সমান আসক্তি। 'বুঝিয়ে বলিতে' আমরা কত ব্যস্ত অনেক সময় নিজেরা বুঝি না। কিন্তু 'বুঝিয়ে বলা' যে অনেক সময়ই 'হিং টিং ছটের' ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, যে বুঝায় সে বোঝে না:

"বল্‌ছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে,
অর্থাৎ কিনা লাগ্‌ছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে,—
গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোত্থেকে আর কি করে
রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।"

ব্যাখ্যা একেবারে পঞ্চভূতের মূলেতে গিয়া ঠেলা মারে নাই কি ?

এই যে বেদান্তবিলাসী ইহার অতি নিকট আত্মীয় রামগরুড়ের ছানা, যিনি হাসিতে জানেন না এবং প্রাণত্যাগ করিবেন, তবুও হাসিবেন না।

"রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়,
নিষেধ সেথায় হাসা।"

তবে পাছে কেহ মনে করে সুকুমার রায়চৌধুরী একদেশদর্শী, তাই 'রামগরুড়ের ছানা'তে তিনি যত মজা পাইয়াছেন, 'আহ্লাদী'তেও ততখানিই। যে হাসিতে জানে না সেও যেমন আজগুবি, যে অকারণে হাসে সেও তেমনই উদ্ভট। তাহাকেও সুকুমার দেখিয়াছিলেন :

"পড়তে গিয়ে ফেল্‌ছি হেসে 'কখগ' আর ঘোট দেখে—উঠ্‌ছে হাসি ভস্ ভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।" 'ট্যাশগরু' এবং 'কিম্ভূতে' কবি শুধু কটাক্ষ করেন নাই, অপরিসীম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আজ 'ট্যাশগরু' প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও যাহাকে ইঙ্গবঙ্গ সমাজ বলিত তাহার কথা ভাবিয়া সুকুমার আনন্দ পান নাই, ব্যথিত হইয়াছিলেন। গাত্রের ত্বকে কৃষ্ণবর্ণ, রক্তে ভারতীয়, এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে তৎপর এই বহুমূল্য 'অকিড' সম্প্রদায়ের জীবনের বিফলতা তাঁহাকে ক্রোধপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল। তাই 'ট্যাশগরুতে' আমরা আনন্দ পাই না। যে বালকের মন লইয়া সুকুমার জীবনকে উপভোগ করিয়াছিলেন সে বালক

হঠাৎ বয়োপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাই তাহার ক্ষমা নাই। সে শুধু দর্শক নয়, সমালোচক। সমালোচকও নয়, নিন্দুক।

"রুচি নাই আমিষেতে, রুচি নাই পায়সে
সাবানের সুপ আর মোমবাতি খায় সে।
আর কিছু খেলে তার কাশি ওঠে খক্ খক্
সারা গায়ে ঘিন্ ঘিন্ ঠ্যাং কাঁপে ঠক্ ঠক্।"

বেশ বুঝা যায়, 'ট্যাশগরু' দেখিয়া কবির গা ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিয়াছে। বালকের গা ঘিন্ ঘিন্ করে না। সে বিলাস মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির। তাই ইঙ্গবঙ্গ সমাজের এই উগ্র সমালোচনা আমাদের পীড়িত করে। আজ এই সমাজ প্রায় লুপ্ত; কারণ, ইঙ্গবঙ্গ হইতে গেলে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও অন্তত বিলাত যাইতে হইত। ফিরিয়া আসিয়া সকলেই কিছু কালচারের বৃক্ষচূড়ে বসিতে পারিতেন না; কিন্তু বিলাত হইতে ফিরিয়া অনেকেই স্বচ্ছল জীবন যাপন করিতে পারিতেন। আজ বিলাত যাওয়া সহজও হইয়াছে, গা-সহাও হইয়াছে; এবং বিকৃত রুচি আয়ত্ত করিবার জন্য আর কষ্ট করিয়া বিলাত যাইতে হয় না; একবার টালিগঞ্জ ঘুরিয়া আসিলেই চলে। তাই 'ট্যাশগরু'র প্রতি আর আমাদের বিদ্বেষের অবকাশ নাই।

কিন্তু 'ট্যাশগরু'তে বিদ্বেষের আতিশয্য বালকোচিত কৌতূহলকে অবদমিত করিলেও, 'কিম্ভূতে' উচকপালে সৌখীনতার বিফলতা তাঁহাকে মুগ্ধ ও ব্যথিত করিয়াছে। সব কিছু হইতে গেলে পরিণামে কিছুই না হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী।

"এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না—
কি যে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না।"

কোকিলের কণ্ঠ, আকাশে উড়িবার ডানা, হাতীর শুঁড়, ক্যাঙ্গারুর ঠ্যাং, সিংহের কেশর, গোসাপের লেজ সব মিলাইয়া যে বিদ্‌ঘুটে জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, তাহাকে অন্তিমে পস্তাইতেই হয়।

"নই ঘোড়া, নই হাতী, নই সাপ বিচ্ছু,
মৌমাছি প্রজাপতি নই আমি কিচ্ছু।
মাছ ব্যাং গাছ পাতা জলমাটি ঢেউ নই,
নই জুতা নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই।"

জীবনকে সখের রঙ্গভূমিতে পরিণত করিতে যে কেহ সচেষ্ট হইয়াছে তাহাকেই এই আক্ষেপ করিতেই হইবে। আমাদের বাঙ্গালীদের পক্ষে এই 'ইক্লেক্‌টিসিজ্‌ম' এই কালচার-বিলাস মনকে আচ্ছন্ন করার কারণ হয়ত এই যে আমরা নিজেদের শক্তিতে আস্থাবান নহি, এবং জীবনের সম্মুখে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইবার সাহস

আমাদের নাই। 'হুঁকো মুখো হ্যাংলা' যার বাড়ী বাংলাদেশে, 'মুখে তার হাসি নাই'। কেন? 'আফিঙের থানাদার' তার মাতুল শ্যামাদাস—পৃথিবীতে একমাত্র আত্মীয়—সেও মরে নাই। তবে হুঁকোমুখোর এমন হাল কেন? বেচারার দুটি মাত্র লেজ, মাছি তাদে বসিলেও মারিতে জানে বামে বসিলেও পিছপাও নয়, কিন্তু কোনও মাছি ঠিক মাঝখানে যদি আসিয়া বসে, বুরিভানের গাধার মত সে বেচারী একেবারেই হতভম্ব।

"যদি দেখি কোন পাজি বসে ঠিক মাঝামাঝি,
কি যে করি ভেবে নাহি পাইরে—
ভেবে দেখ এ কি দায়, কোন ল্যাজে মারি তায়,
দুটি বই ল্যাজ মোর নাইরে!"

তাই ত! কি সর্ব্বনাশ!

ব্যক্তি ও সমাজ সুকুমার রায়চৌধুরীর মনে বহু আনন্দ জোগাইয়াছিল। রাষ্ট্র কত আনন্দ জোগাইত বলা যায় না। আরও কিছুদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাঁহার হাত হইতে অপূর্ব্ব রাজনৈতিক স্যাটায়ার বাহির হইত, কারণ উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ রচনার সমস্ত গুণই তাঁহার ছিল। তবে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে 'একুশে আইনে' তিনি বিদেশী শাসনের অত্যন্ত উপভোগ্য বিদ্রূপ করিয়াছেন।

শিব ঠাকুরের আপন দেশে
আইন কানুন সর্ব্বনেশে।

যেমন সর্ব্বনেশে আইন কানুন, তেমনি সর্ব্বনেশে তাঁহার পরিহাস। এই শিব ঠাকুরের দেশে

সেথায় সন্ধ্যে ছটার আগে
হাঁচতে হলে টিকিট লাগে;
হাঁচলে পরে বিন্ টিকিটে
দমদমাদম্ লাগায় পিঠে,
কোটাল এসে নস্যি ঝাড়ে—
একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে।

'কারফিউ অর্ডার' এই শিব ঠাকুরের দেশেরই আইন নয় কি? 'হযবরল'তে এই বিদেশী শাসনযন্ত্রের অধীন ধর্ম্মাধিকারের বিশেষ উপভোগ্য নক্সা আছে। 'কালো ঝোল্লাপরা হুতোম প্যাঁচা' সেখানে বিচারক এবং কুমীর সেখানে ব্যবহার জীব। ধর্ম্মাবতারের বিশদ পরিচয় দিতে পারিলাম না, কিন্তু 'হযবরল' পড়িলেই তাঁহার সহিত পরিচয় হইবে এবং সহজে তাঁহাকে বিস্মৃত হইবার উপায় নাই। কিন্তু

সুকুমার রায়চৌধুরী মুখ্যত সমালোচক নন, দর্শক। তাই হেড অফিসের বড় বাবুর গোঁফ চুরির রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়িয়া একবারও বড় বাবুর উপর কাহারও রাগ হয় না। সত্যই ত,

"গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"

ভীমলোচনের সঙ্গীতচর্চ্চা সাধারণের পক্ষে পরম বিড়ম্বনক হইলেও, তাঁহার গানের দাপটে 'শূন্য মাঝে ঘূর্ণা লেগে' পক্ষী ডিগ্‌বাজী খাইলেও, দালান ফাটিয়া উঠিলেও 'খোস্‌মেজাজে দিল্‌খুল' এই ব্যক্তিটির উপর কাহারও আক্রোশ হয় না। এমন কি সুকুমার যখন বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতেও জীবনকে দেখিয়াছেন তখনও তাঁহার মার্জ্জিত রুচি ও বলিষ্ঠ কল্পনা অগ্নিপরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছে। 'বুড়ীর বাড়ী' কবিতাটি একেবারেই খেয়ালরসের নয়। অত্যন্ত বস্তুতন্ত্র—বর্ণনায় সুকুমার কিছুই নাই; তথাপি অত্যন্ত সুকুমার মনের স্পর্শে এই কবিতাটি পরম মনোজ্ঞ হইয়াছে।

"গালভরা হাসি মুখে চালভাজা মুড়ি
ঝুরঝুরে প'ড়ো ঘরে খুরথুরে বুড়ী।
কাঁথাভরা ঝুল্‌কালী মাথাভরা ধূলো
মিটমিটে ঘোলা চোখ, পিঠখানা কুলো।

* * *

ছাদ্‌গুলো ঝুলে পড়ে বাদ্‌লায় ভিজে,
একা বুড়ী কাঠি গুঁজে ঠেকা দেয় নিজে।
মেরামত দিনরাত কেরামত ভারি,
খুরথুরে বুড়ী তার ঝুর্‌ঝুরে বাড়ী।"

বুড়ীর বাড়ী এবং বুড়ী এ দুয়ের কোনটিকে লইয়াই কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন নাই। খাঁটি বাঙ্গালী মনের পক্ষে বুড়ীকে দেখিয়া অশ্রুবহুল দয়ার উদ্রেক হওয়া উচিত ছিল। পনের বৎসর আগে 'খুরথুরে' কথাটির ব্যবহার রিয়ালিষ্ট মহলে ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু 'বুড়ীর বাড়ী' কবিতাটিতে 'ঝুর ঝুরে' এবং 'খুরথুরে' ফ্যাশন-বিলাসে পর্য্যবসিত হয় নাই। জীর্ণতার এই পরিবেশও কবির বালক-সুলভ চক্ষে সুন্দর ঠেকিয়াছিল, এবং সুন্দর ঠেকিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছাঁটা ছাঁটা ছন্দে গতিশীল হইয়া উঠিয়াছিল। এই কবিতাটীর সম্পূর্ণ উপভোগের জন্য সুকুমার রায়চৌধুরীর নিজের হাতে আঁকা বুড়ীর ছবি একবার দেখা দরকার। শিল্পী সুকুমার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হইবে, কিন্তু তাঁহার হাতের রেখাও যে কত সজীব ছিল মিটমিটে ঘোলাচোখো এই বুড়ীর ছবি দেখিলেই বোঝা যায়।

হোক না তার বাড়ী ঝুরঝুরে, তার পিঠখানা কুলোর মত। এত সজীব যে বুড়ী তাহার দুঃখে কাতর হইবার গৌরব অর্জ্জন করিতে সমীহ হইবে।

সুকুমার রায়চৌধুরীর কবিতা রচনার মুন্‌সীয়ানা এতই প্রত্যক্ষ যে তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা বলা বাহুল্য। সমস্ত ছন্দে তাঁহার সমান অধিকার। ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, পয়ার, দীর্ঘ পয়ার, সমস্ত ছন্দের স্বচ্ছন্দ উল্লাসে তাঁহার কবিতা প্রাণময়। একদিকে চারের পর্য্যায়ে (সেই চার আবার দুই দুইয়ের সমষ্টি !) গ্রথিত পয়ারের অত্যন্ত দ্রুত গতি :

"একটার। দাঁত নেই। জিভ্ দিয়ে। ঘ'ষে!
একমনে। মোমবাতি। দেশলাই। চোষে!"

অন্য দিকে পাঁচের পর্য্যায়ে দশ মাত্রার ছন্দের দীর্ঘায়িত গতি

"আরেকটি সে। তৈরী ছেলে
জাল করে নোট। গেছেন জেলে।"

যেমন ছন্দের বৈচিত্র্য, তেমনি সূক্ষ্ম কাণ। যাই হোক, ছান্দসিক সুকুমার সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিলেও তাঁহার কাব্যের স্টাইল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সুকুমার রায়চৌধুরী সার্থক কবি, তাই তিনি স্বকীয় স্টাইল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য তীক্ষ্ণ, শাণিত, এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা কবিমানসের অভিজ্ঞতা বলিয়াই তাঁহার ব্যবহৃত শব্দগুলির বিশেষ রূপ আছে। তাহারা এলোমেলো ঘুরিয়া বেড়ায় না, কবির বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার ক্ষমতা তাহারা অর্জ্জন করিয়াছে। সুকুমারের উপমাগুলি ক্ষিপ্র শরের ন্যায় লক্ষ্যবেধ করে। পান্তভূতের জ্যান্ত ছানাকে আদর করিবার সময় তার মা তাহাকে বলিতেছে 'ওরে আমার হামান্ দিচ্চা যষ্টিমধুর মিষ্টিরে'। 'রোদে রাঙা ইটের পাঁজা'র উপর বসিয়া রাঙ্গা যখন নেড়া কবার বেলতলায় যায় এই সমস্যায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিলেন, তখন

"রাঙা মুখ পান্‌সে যেন তেলে ভাজা আম্‌সি হেন"

তাঁহার সম্বন্ধে এই উপমা ভুলিবার নয়।

সুকুমার রায়চৌধুরীর লিরিক স্টাইল 'হযবরল'র কয়েকটি কবিতায় মূর্ত্ত হইয়াছে।

'ঘুস্‌ঘুসে কাশি ঘুষ্‌ঘুসে জ্বর, ফুস্‌ফুসে ছাঁদা বুড়ো তুই মর।
মাজ্‌রাতে বাধা পাঁজ্‌রাতে বাত, আজ রাতে বুড়ো হবি কুপোকাৎ।

অনুপ্রাস অত্যন্ত প্রবল বটে, কিন্তু এই শব্দগুলি ছাড়া এবং তাহাদের ঠিক এই গতি ছাড়া এ কথাগুলি বলা চলিত না। কিন্তু শুধু কথায় সুকুমার রায়চৌধুরী কিরূপ নেশার সৃষ্টি করিতে পারিতেন তাহার পরিচয় পাইতে গেলে 'হুলোর গান' পড়িতে হয়।

"বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে ঘুট্‌ঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশ্‌মিশে মখ্‌মলে ঢাকা,
জটবাঁধা ঝুল কালো বটগাছ তলে,
ধক্ ধক্ জোনাকির চক্‌মকি জ্বলে।"

এখানে প্রত্যেকটি শব্দ সজীব—অন্ধকার রূপময় হইয়া উঠিয়াছে। বটগাছের বয়াগুলির ঝাপ্‌সা ছায়া দেখা যাইতেছে। জোনাকির চক্‌মকি আলো যেন শব্দগুলির পরস্পর সংঘর্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইহাকেই বলে স্টাইল, এবং এই স্টাইলের পরিচয় 'আবোল তাবোলে' প্রচুর।

'আবোল তাবোলে'র কবির কাব্যের বিশ্লেষণ আমার অভিপ্রেত নয়। তাঁহার কাব্য এখনও যে উপভোগ করি এবং পরেও কবির আশা রাখি, তাহারই কথা বলিলাম। যে অভিজ্ঞতা ছাড়া কাব্য কখনও সার্থক হয় হয় না, সেই অভিজ্ঞতা সুকুমার রায়চৌধুরীর অর্থহীনতার ছদ্মবেশেও প্রত্যক্ষরূপে ধরা দেয়। তিনি বালকদের ভঙ্গীতে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কাব্যবিচারের ভিন্ন মাপকাঠির যে প্রয়োজন নাই ইহাই মাত্র নির্দ্দেশ করিতে চাই। জীবনকে যে ভাল বাসে না, সে আর যাই হোক কবি নয়। সুকুমার রায়চৌধুরীর কাব্যে এই জীবনকে সম্যক উপভোগ করিবার যে নিদর্শন রহিয়াছে তাহাই তাঁহাকে কবির মর্য্যাদা দিবে। রঙ্গ তামাসা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কাব্যকে এক পাশে সরাইয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার শেষ কবিতা 'আবোল তাবোল' আমাদের ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ লিরিক।

"মেঘ মুলুকে ঝাপ্‌সা রাতে
রামধনুকের আব্‌ছায়াতে
তাল বেতালে খেয়াল সুরে
গান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।"

মৃত্যু সমাগত। তাহাকে তিনি দেখিতে পাইতেছেন। তবুও জীবনের প্রতি কি সুগভীর অনুরাগ :

"আজকে দাদা যাবার আগে
বলব্‌ যা মোর চিত্তে লাগে
নাই বা তাহার অর্থ হোক
নাই বা বুঝুক বেবাক লোক।"

কিন্তু বেবাক লোক নাই বা বুঝিবে কেন? বেবাক লোক সুকুমার রায়-চৌধুরীর ন্যায় অকুতোভয়ে মরণকে আলিঙ্গন করিতে পারে না;

কিন্তু যে অদ্ভুত বলে বলীয়ান হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও সুকুমার বলিতে পারিয়াছিলেন

"আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।"

সেই শক্তিকে শ্রদ্ধা করিবে না এমন বর্ব্বর জন্মগ্রহণ করে নাই। আর এই শক্তি তিনি যে উৎস হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে তাঁহার জীবনের পূজায়, যাহার সম্বন্ধে খেয়ালের ছলে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"দাদারে দাদা দেখছি ভেবে অনেক দূর,—এই দুনিয়ার সকল ভাল।"
দুনিয়ার সকল কিছু ভাল না লাগিলে
'কাঁচাও ভাল পাকাও ভাল
সোজাও ভাল বাঁকাও ভাল'

না লাগিলে কেহ কবি হয় না। সুকুমার রায়চৌধুরীর ভাল লাগিয়াছিল, তাই অসম্ভবের ছন্দের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তিনি কবি।

বর্ত্তমান যুদ্ধে নৌবল

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

গত শতাব্দীর শেষের দিকে মাহান কলম প্রভৃতির রচনা প্রকাশিত হয়। নৌবলের মূল্য কার্য্যক্ষেত্রে ইহার পূর্ব্বে বারবার প্রমাণিত হইয়া গেলেও সামরিক তত্ত্বের আলোচনায় উহাকে এত বড় করিয়া আগে কেহই দেখান নাই।* তখন হইতে প্রধানত মাহানেরই শিক্ষার ফলে নৌবলের শ্রেষ্ঠত্ব, কি ঐতিহাসিক কি রাষ্ট্রনীতিবিদ্, সকলেই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। দুইটি বড় দেশ বা জাতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যে দেশ নৌবলে শ্রেষ্ঠ পরিণামে তাহারই জয় হয়, যে পক্ষ শুধু সেনাবলে শ্রেষ্ঠ সে আপাতপ্রাধান্য লাভ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত উহা বজায় রাখিতে পারে না, মোটামুটিভাবে ইহাকেই মাহানের ঐতিহাসিক ও সামরিক গবেষণার মূল কথা বলা যাইতে পারে। অবশ্য এখানে বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন, মাহান কেবল মাত্র স্থলপথে কিংবা সীমাবদ্ধ কোন একটা অঞ্চলে সামরিক প্রাধান্যের কথা ধরেন নাই, 'ওয়ার্ল্ড পাওয়ার' বা বিশ্বশক্তি হইবার উপায় হিসাবে নৌবলের মূল্য কতটুকু তাহাই নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া অর্থাৎ নেপোলিয়নের পরাজয় পর্য্যন্ত ইংরেজ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার আলোচনা করিয়া তিনি 'গ্র্যাণ্ড ষ্ট্রাটেজি' বা উচ্চতম সমর-নীতির মূলসূত্র নির্দ্দেশ করিতে গিয়াছিলেন ; এই প্রতিযোগিতার সহিত ইউরোপের 'ব্যালান্স অফ্ পাওয়ারে'র সম্পর্ক থাকিলেও উহার ক্ষেত্র অনেক বেশী বিস্তৃত ছিল, ফলও অনেক বেশী সুদূরগামী হইয়াছিল, উহার আসল রূপ ইংরেজ ও ফরাসী জাতির ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নৌবল সম্বন্ধে মাহান যে থিওরী প্রচার করিয়াছিলেন উহা এই বৃহত্তর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এই সিদ্ধান্ত এখন পর্য্যন্তও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। বুরবোঁদের রাজত্বকালে ফ্রান্স সেনাবলে শ্রেষ্ঠ হইয়াও সাম্রাজ্য বিস্তারে ইংরেজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কৃতকার্য্য হয় নাই, এমন কি ইউরোপেও একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের যুগেও ইহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। পশ্চিম ইউরোপে নেপোলিয়নের সার্ব্বভৌমত্ব স্থায়ী হইতে পারে নাই

* এই প্রবন্ধের সর্ব্বত্র 'সি-পাওয়ারে'র প্রতিশব্দ হিসাবে 'নৌবল', 'ল্যাণ্ড-পাওয়ার' ও 'এয়ার-পাওয়ারে'র প্রতিশব্দ হিসাবে 'সেনাবল' ও 'বিমানবল' এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রধানত ইংরেজের নৌবলের জন্য। ইতিহাসের এই ধারা প্রণিধান করিয়াই জার্ম্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম শুধু সেনাবাহিনীতে অদ্বিতীয় হইয়া আশ্বস্ত বোধ করেন নাই, একটা বিরাট নৌবাহিনী সৃষ্টি করিতেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে গ্র্যাণ্ড আডমিরাল ফন টিরপিটস্ তাঁহার সহায়ক ও মন্ত্রদাতা ছিলেন। কিন্তু কাইজার নিজেও নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কম সচেতন ছিলেন না। তিনি মাহানের রচনাবলী যত্নের সহিত পড়িয়াছিলেন। সুতরাং জার্ম্মান নৌবাহিনী গঠনের কাজে উইলিয়মের সম্মতি ও উৎসাহ পাইতে ফন টিরপিটস্‌কে বেশী বাক্যব্যয় করিতে হয় নাই।

ইহাদের চেষ্টা সত্বেও জার্ম্মান নৌবহর ব্রিটিশ নৌবহরের সমান হইতে পারে নাই। এই দুর্ব্বলতাই ১৯১৪-১৮ সনে জার্ম্মানির পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অসাধারণ সামরিক শক্তি ও সাফল্য সত্ত্বেও জার্ম্মানি গত যুদ্ধে যে পরাজিত হইয়াছিল তাহার মুখ্য কারণ ইংরেজের নৌবল। আজ আবার নৌবল ও সেনাবলের সেই পুরাতন প্রতিযোগিতা নূতন রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে। সমগ্র পশ্চিম ইউরোপকে আয়ত্ত করিয়াও জার্ম্মেনি যুদ্ধ শেষ করিতে পারিতেছে না একটি কারণে—ইহার পর সমুদ্র, সেই সমুদ্রে ইংরেজ নৌবাহিনী অপরাজিত, এবং জার্ম্মেনির বর্ত্তমান শক্তিতে অপরাজেয়। সেনাবলে প্রধান দেশ কি করিয়া নৌবলে প্রধান দেশকে পরাজিত করিতে পারে এই সমস্যা নেপোলিয়নের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, হিটলার এবং জার্ম্মান জেনারেল ষ্টাফের সম্মুখেও আজ সেই একই সমস্যা। উহা তাঁহাদিগকে চিন্তান্বিত করিয়া যে তুলিয়াছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, সমাধানের চেষ্টাও যে প্রাণপণে চলিতেছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। হয়ত মাস কয়েকের মধ্যে জার্ম্মেনি এই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা হইতে বাহির হইয়া পড়িবার প্রচণ্ড একটা চেষ্টা করিবে। কিন্তু এখনও যে ব্রিটেনের নৌবলকে অতিক্রম করিবার কোন পথ জার্ম্মান সামরিক নেতারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই তাহা সুস্পষ্ট।*

আশা ছিল, নৌবলকে বিমানবলের দ্বারা পরাজিত করিতে কিম্বা তাহা না পারিলেও অন্তত অতিক্রম করা যাইবে। এ বিষয়ে গত কুড়ি বাইশ বৎসরের মধ্যে বহু আলোচনা বহু তর্ক হইয়াছে। এই তর্ক কেবল মাত্র সমরবিদ্ মহলে আবদ্ধ থাকে নাই, বহু অসামরিক ব্যক্তিকেও অনধিকারচর্চ্চায় প্ররোচিত করিয়াছে।

* মাত্র দিনকয়েক আগে সুপরিচিত জার্ম্মান সামরিক লেখক ফন্ হোলশায়ার হার্ৎজ 'মুনশেনের নাখ্‌রিখ্‌টেন' পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"যুক্তরাজ্যের সেনেটের ম্যারিটিম কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি সর্ব্বতোভাবে সেই মতাবলম্বী—দ্বীপবাসী জাতি যতদিন জলপথে প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারিবে ততদিন তাহাকে পরাভূত করা যাইবে না।"

এই বিচারে কেহ নৌবলের সপক্ষে কেহ বা বিপক্ষে রায় দিয়াছেন। সাধারণের মনে যে ধারণা বেশী দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহা অবশ্য এই যে, বোমাবর্ষী বিমানের আক্রমণের সম্মুখে রণতরী টিঁকিতে পারিবে না, সুতরাং বিমানবলের আবির্ভাবের ফলে নৌবাহিনীর সেই পূর্ব্বকালীন প্রাধান্য লুপ্ত হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধে কিন্তু এইরূপ কোন লক্ষণ দেখা দেওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত সিদ্ধান্তই প্রমাণ হইতে চলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ পর্য্যন্ত নৌবলের সহিত বিমানবলের সংঘর্ষে কি ঘটিয়াছে তাহার একটা হিসাব লইলেই এই অনুমান যে একেবারে অযথা উক্তি নয় তাহা বুঝা যাইবে। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে বর্ত্তমান যুদ্ধে নৌবাহিনীর উপর বিমান আক্রমণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই চুম্বকে নৌবলের সহিত বিমানবলের সংঘর্ষের 'স্ট্র্যাটেজিক্যাল' ও 'ট্যাক্টিক্যাল' ফলাফল স্বতন্ত্র ভাবে দেখান হইয়াছে।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, বিমানবলের আবির্ভাবে নৌবলের কার্য্যকারিতা ও ক্ষেত্র খানিকটা সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। তেমনই মাইন, টর্পেডো এবং দূর পাল্লার কামান আবিষ্কারেও নৌবহরের শক্তি কিয়দংশে খর্ব্ব হইয়াছিল। তবু ইহাদের কোনটির দ্বারাই যেমন নৌবাহিনী প্রয়োগের মূল সূত্রের ব্যতিক্রম হয় নাই, তেমনই বিমানবাহিনীর দ্বারাও হয় নাই। এ বিষয়ে যাঁহারা গোঁড়ামি প্রদর্শন করেন তাঁহাদের বড় ভুল এই যে, তাঁহারা ধরিয়া লন বিমানবাহিনী নির্ব্বিবাদে নৌবাহিনীকে আক্রমণ করিতে পারিবে, অর্থাৎ অপর পক্ষের বিমানবাহিনী হইতে কোন বাধা আসিবে না। কার্য্যক্ষেত্রে তাহা কখনও ঘটে না, ঘটিতে পারে না। সুতরাং প্রায়ই দেখা যায়, অপরপক্ষের বিমানবাহিনীকে প্রতিরুদ্ধ করিবার পর যে টুকু বিমানশক্তি উদ্বৃত্ত থাকে শুধু তাহাই নৌবাহিনীর উপর প্রযুক্ত হইতে পারে। আরও বলা প্রয়োজন, কখন কতটুকু বিমানশক্তি উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা কেবলমাত্র দুইপক্ষের এরোপ্লেনের সংখ্যা গুণিয়াই বলা সম্ভব নয়, ইহার মধ্যে দূরত্ব, এয়ারোড্রোমের সুযোগসুবিধা প্রভৃতি আরও অনেক প্রশ্ন আছে। মোটের উপর বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর শক্তির তুলনা করিয়া আজিকার অভিজ্ঞতায় নীচের সূত্রগুলিকে সাধারণত ঠিক বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে:—

১। ঘাটি হইতে পাঁচ ছয় শত মাইল ব্যাসার্দ্ধের বাহিরে বিমানবাহিনী নৌবাহিনীর চলাচলে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না; অর্থাৎ দূরদেশের সহিত রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যগত সম্পর্ক অব্যাহত রাখিবার একমাত্র উপায় এখনও নৌবাহিনী। এই ক্ষেত্রে বিমানবল প্রবেশ করিতে পারে শুধু এরোপ্লেনবাহী জাহাজে করিয়া। কিন্তু এরোপ্লেনবাহী জাহাজের চলাচল নির্ভর করে নৌবলের উপর; সুতরাং পোতবাহিত বিমানবলকে নৌবলেরই আর এক রূপ বলা উচিত।

২। পাঁচ ছয় শত মাইলের মধ্যে নৌবহরের চলাচল বিমানবাহিনী বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু বন্ধ করিতে পারে না। এত বড় ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংখ্যক এরোপ্লেন নিযুক্ত রাখা অসম্ভব। সুতরাং আক্রমণ অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতে পারে না। তাহা ছাড়া স্থলে অবস্থিত গতিহীন লক্ষ্যের তুলনায় যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণ এরোপ্লেনের পক্ষে অনেক দুরূহ। প্রথমত, জাহাজ সচল; দ্বিতীয়ত উহাতে আয়তনের অনুপাতে এরোপ্লেন মারিবার কামান বা মেশিন-গানের সংখ্যা খুবই বেশী থাকে। সুতরাং শুধু বিমানবাহিনীর দ্বারা 'নর্থ-সি' বা ভূমধ্যসাগরের মত অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ সমুদ্রেও নৌবহরের গতিবিধি বন্ধ করা বিমানবাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়।

৩। স্থলে অবস্থিত এরোপ্লেন ঘাটির অতি নিকটে অর্থাৎ ১০০ শত মাইলের মধ্যে, কিংবা অতি সঙ্কীর্ণ জলপথে বিমানবাহিনী নৌবাহিনীর চলাচল দিনের বেলায় একেবারে বন্ধ রাখিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম যে না হইয়াছে তাহা নয়। সিসিলির দক্ষিণ উপকূল ও উত্তর আফ্রিকার উপকূলের মধ্যে সমুদ্রপথ বেশ সঙ্কীর্ণ। মাঝখানে আবার পান্তেলারিয়ার দুর্গ থাকায় আরও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুদ্ধের আগে সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন, ইতালিয়ান বিমানবাহিনীর আক্রমণে এই পথ দিয়া ইংরেজের নৌবহর যাতায়াত করিতে পারিবে না। যুদ্ধ বাধিবার পর কিন্তু দেখা গেল, যাতায়াত সঙ্কুচিত হইলেও বন্ধ হয় নাই। এমন কি ইতালিয়ান বিমানবাহিনীর আক্রমণে সেদিন পর্য্যন্তও যুদ্ধ বা বাণিজ্য জাহাজের কোন ক্ষতিই হয় নাই। মাত্র ১০ই জানুয়ারী তারিখে জার্ম্মান বিমান-বাহিনীর আক্রমণে একখানা জাহাজ নষ্ট হইয়াছে ও অন্য দুইখানা যুদ্ধজাহাজের অল্পবিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত এই ধরণের সঙ্কীর্ণ জলপথে এরোপ্লেন ছাড়া মাইন এবং টর্পেডোর দ্বারাও নৌবহরের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা যায়।

বিমানবাহিনীর সপক্ষে আর একটা যুক্তি দেখান হইয়া থাকে, এই প্রসঙ্গে উহারও উল্লেখ করা উচিত। বিমানের ওকালতীতে বলা হয়, একটি যুদ্ধের জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে যে অর্থ ও সময়ের দরকার তাহাতে দশ বিশ খানা কেন, আরও অনেক বেশী এরোপ্লেন লোকসান দিয়াও যদি একখানা যুদ্ধ জাহাজ ঘায়েল করা যায় তাহা হইলেও মুনাফা থাকে। যেমন, একখানি 'ব্যাটলশিপ' তৈয়ারীর খরচ আন্দাজ দশ কোটি টাকা; নির্ম্মাণের সময় বৎসর তিনেক; এই খরচে ৩০০ হইতে ৪০০ বোমাবর্ষী এরোপ্লেন তৈরী হইতে পারে, তাহার উপর আবার এই তিন চার শত এরোপ্লেন তৈরী করিতে জার্ম্মেনি বা আমেরিকা বা গ্রেট ব্রিটেনের বিমানশিল্পের খুব বেশী হইলেও দুই সপ্তাহের বেশী সময় লাগিবার কথা নয়; সুতরাং আক্রমণ যদি সফল হয়

তাহা হইলে পঞ্চাশ খানা এরোপ্লেন নষ্ট হইলেও ক্ষতি নাই; সফল হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কারণ এত এরোপ্লেনের সম্মিলিত আক্রমণের সম্মুখে 'ব্যাটলশিপ' টিঁকিয়া থাকিতে পারে না।

কাগজকলমে এই যুক্তি অকাট্য বলিয়া মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে উহা সত্য হইবার সম্ভাবনা কতটুকু তাহা সন্দেহজনক। প্রথমত, তিন চার শত এরোপ্লেনের পক্ষে একটি ব্যাটলশিপকে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিবার মত সুযোগ সাধারণত পাওয়া যাইবে না; দ্বিতীয়ত, ব্যাটলশিপ কখনও একাকী থাকিবে না, তাহার সঙ্গে অন্য যুদ্ধজাহাজ এবং পোতবাহিত এরোপ্লেনও থাকিবে; তৃতীয়ত, ব্যাপকভাবে নৌবহরের উপর বিমান আক্রমণের চেষ্টা হইলেই অন্য পক্ষের বিমান-বহরও আসিয়া যোগ দিবে। একদিকে শুধু অল্পসংখ্যক যুদ্ধ জাহাজ অন্যদিকে অগণিত এরোপ্লেন, একমাত্র এই অবস্থার উদ্ভব হইলেই সংখ্যা ও ব্যয়ের তুলনামূলক যুক্তি কার্য্যক্ষেত্রে সত্য হইতে পারে। অকল্পনীয় না হইলেও এই অবস্থাসৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বিমানবাহিনী হইতে নৌবাহিনীর পক্ষে এমন কোন বিপদ দেখা দেয় নাই যাহার জন্য এ কথা বলা যাইতে পারে যে, নৌবহরের যুগ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। বরঞ্চ বলা উচিত এরোপ্লেনের জন্য কতকগুলি ব্যাপারে নৌবাহিনীর যেমন অসুবিধা হইয়াছে, তেমনই অন্য কতকগুলি বিষয়ে সুবিধাও হইয়াছে। প্রথমত, এরোপ্লেনের জন্য নৌবাহিনীর পক্ষে শত্রুপক্ষের গতিবিধি সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করা সহজ হইয়াছে; দ্বিতীয়ত, এরোপ্লেন দিয়া অপর পক্ষের সাবমেরিনকে খুঁজিবার এবং মারিবারও অনেক বেশী সুবিধা হইয়াছে; তৃতীয়ত, এরোপ্লেনের জন্য শত্রুপক্ষের ঘাটিতেও যুদ্ধ জাহাজের উপর আক্রমণ করা সম্ভব হইয়াছে (উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, তারান্তো); পূর্ব্বে তাহা একেবারেই সম্ভব ছিল না। নৌবহর ও বিমানবহরের মধ্যে হিসাব নিকাশ পরিষ্কার করিতে হইলে এই সুবিধাগুলি জমার দিকে ধরা প্রয়োজন। *

* একটা কথা হয়ত বলিয়া রাখা ভাল—বর্ত্তমান যুগে বিমানবাহিনী ভিন্ন কি জলে কি স্থলে কোথাও যুদ্ধ চলিতে পারে না, জয়লাভও সম্ভব নয়, এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা মাত্র, উহা পুনরাবৃত্তির অপেক্ষা রাখে না। ইহা ছাড়া আরও একটা বিষয় মনে করাইয়া দেওয়া উচিত। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর তুলনামূলক বিচারে মতের কোনপ্রকার ঐক্য এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। বিমানবাহিনীর আবির্ভাবের আগেও নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে এই রেষারেষির পরিচয় যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইত। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধের আগে ফরাসী সেনানায়কেরা ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কোন মূল্য দিতে চাহেন নাই। দিগ্ মার্শাল স্যর হেনরী উইলসন তাঁহার ডায়ারীতে

এই সহজ ও সাধারণ কথাগুলি এত সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বলিতে হইল একটি কারণে—আমাদের মধ্যে নৌবাহিনীর মূল্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই প্রায় নাই বলিয়া এবং বিমানবাহিনীর অভ্যুদয়ের পর নৌবাহিনী সম্বন্ধে অনেকগুলি ভ্রান্ত কথাবার্তা প্রায়ই শোনা যায় বলিয়া।

ভূমিকা হিসাবে শুধু আর একটা কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মেনির প্রধান ভরসা বিমানবল। তবু জার্ম্মেনিতেও নৌবলকে তুচ্ছ বা হীন প্রতিপন্ন করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে এক জন জার্ম্মান সামরিক লেখকের উক্তি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, আর এক জনেরও উক্তি প্রণিধান করিবার মত। ইনি বলিতেছেন, "প্রত্যেকটি বড় দেশের স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা এবং বিমানবলের আবির্ভাব সত্ত্বেও বর্ত্তমান জগৎ নৌবল ও নৌযুদ্ধের উপকরণ সম্বন্ধে নূতন করিয়া সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। উহার লক্ষণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই নব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের অজ্ঞাতসারে, এমন কি বিশ্বের রাষ্ট্রীয় ধারা সম্বন্ধে যাঁহারা কৌতূহলী তাঁহাদেরও অজ্ঞাতে জার্ম্মেনিতে নৌযুদ্ধনীতির এমন একটা বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যাহার ফলে নৌযুদ্ধকে আমরা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।" এই উক্তি যিনি করিয়াছেন, তাঁহার নাম এর্ণষ্ট হিলহেল্‌ম্ ক্রুজে। তিনি যে বিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ যথাস্থানে করা হইবে। এখানে এইটুকু মাত্র বক্তব্য যে, বিমানবাহিনীর আবির্ভাবে নৌবল যদি জার্ম্মেনিতেও হতমান না হইয়া থাকে তাহা হইলে অন্যত্র হইবারও কারণ নাই।

২

এইবারে আসল কথায় আসা যাক। বর্ত্তমান যুদ্ধে নৌবলের প্রয়োগ কি ভাবে হইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে, ইংরেজ ও জার্ম্মান দুই পক্ষের দিক হইতেই গত যুদ্ধ ও সেই যুদ্ধের উদ্যোগ পর্ব্বের দিকে একটু দৃষ্টিক্ষেপ করা প্রয়োজন। কাইজারের নৌবাহিনীর স্রষ্টা ফন টিরপিট্‌স্। তিনি অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ নৌ-সেনাপতি ছিলেন। নৌযুদ্ধে জয় লাভের জন্য কি প্রয়োজন সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লিখিত বিখ্যাত ৯নং 'সার্ভিস মেমোরেণ্ডামে' নৌযুদ্ধে সাফল্য লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে তিনি যাহা

(১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৩) লিখিয়াছিলেন, "রেপিটন সম্প্রতি 'টাইম্‌সে' যে সব প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন—যাহাতে তিনি বলিয়াছেন মারাত্মক জায়গায় যবানীদের সাহায্য হিসাবে আমাদের নৌবহর ৫০,০০০ সঙ্গীণের তুলামূল্য—উহার সম্বন্ধে কাস্তেলানো ও জফ্‌র্-এর সঙ্গে কথা হইল। আমি ফ্রেড অলিভারকে লিখিয়াছিলাম যে, আমাদের নৌবহর ৫০০ সঙ্গীণের সমানও নয়। কাস্তেলানো এবং জফ্‌র্ উহাকে একটি সঙ্গীণের মূল্য দিতেও প্রস্তুত নন!"

লিখিয়াছেন তাহার সারকথা এই—(১) নৌযুদ্ধ সাফল্যের জন্য সমুদ্রপথে প্রাধান্য (কমাণ্ড অফ্ দি সি) আয়ত্ত করা প্রয়োজন, ক্রুজার দ্বারা বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ করিয়া কিংবা অন্য উপায়ের দ্বারা তাহা সম্ভব নয়; (২) উহার জন্য 'অফেন্সিভ' অবলম্বন করিয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিতে হইবে, কেবলমাত্র 'ডিফেন্সিভ' নীতি ধরিয়া থাকিলে নানারূপ অসুবিধা হইবে ও সাফল্যের কোন আশাই প্রায় থাকিবে না; এবং (৩) সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, 'অফেন্সিভে'র জন্য শক্তিতে ও সংখ্যায় অন্য পক্ষের তুলনায় স্বকীয় নৌবাহিনীর অন্তত এক-তৃতীয়াংশ আধিক্য থাকা আবশ্যক।

প্রথম দিকে জার্ম্মেনির নৌবল এই নীতির উপরই গড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তখন জার্ম্মান নৌবাহিনীর প্রতিপক্ষ ছিল ফরাসী ও রুশ নৌবাহিনী। ইহাদের উপরে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ প্রাধান্য লাভ করা জার্ম্মেনির পক্ষে অসম্ভব হইত না। কিন্তু ইহার পরই প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল ব্রিটিশ নৌবাহিনী, সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা ও হিসাবের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তখন দেখা গেল, ইংরেজের সহিত যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণে প্রতিযোগিতা করিয়া এক-তৃতীয়াংশ প্রাধান্য দূরে থাকুক, সাম্য লাভ করাও জার্ম্মেনির শক্তির অতীত। সুতরাং টিরপিটসের পক্ষে ৯নং মেমোরেণ্ডামের নীতি অনুসরণ করা আর সম্ভব রহিল না।

টিরপিট্‌স্ যদি ব্যাপারটা শুধু নৌযুদ্ধনীতির দিক হইতে দেখিতেন তাহা হইলে ইংরেজের সহিত নৌবলে প্রতিযোগিতা করিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই তাঁহার পক্ষে সমীচীন হইত। কিন্তু টিরপিটসের রাজনৈতিক মতামতও কম প্রবল ছিল না, জার্ম্মেনিকে সবদিকে প্রধান করিবার স্বপ্ন বর্জ্জন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। ইহা ছাড়া গ্রেট ব্রিটেন এবং জার্ম্মেনির রাজনৈতিক রেষারেষি ক্রমে ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে, কাইজার এবং অন্য জার্ম্মান রাষ্ট্র নেতারাও ইংরেজের সহিত নৌবলে প্রতিযোগিতা করিবার চেষ্টা ছাড়িতে পারিলেন না। ফলে টিরপিটস্ জার্ম্মান নৌযুদ্ধনীতির পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

তখন তিনি বলিলেন, সমগ্র ব্রিটিশ নৌবাহিনীকে আক্রমণ করিয়া সাফল্য লাভ করা যখন সম্ভব নয় তখন জার্ম্মান নৌবাহিনীকে যুদ্ধনৈপুণ্যে, সংখ্যায়, ও গঠনে অন্তত এতটুকু শক্তিশালী হইতে হইবে যাহাতে অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইলে সে আক্রমণকারীর বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে। তিনি এই ভরসাও দিলেন, তাঁহার শিক্ষা ও পরিচালনার ফলে জার্ম্মান নৌবাহিনী প্রতিপক্ষকে এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে যে, অন্যেরা ভয়েই জার্ম্মেনিকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইবে না। ইহাই তাঁহার সুবিখ্যাত "রিস্ক থিওরী"।

'রিস্ক থিওরী'র রাজনৈতিক হিসাব ছাড়া রণনৈতিক হিসাবও একটা ছিল। সে হিসাব এই—প্রতিপক্ষ 'নর্থ সি'তে কিংবা হেলিগোল্যাণ্ড বাইটে যখন জার্ম্মান নৌবাহিনীকে আক্রমণ করিবে, তখন জার্ম্মান নৌবাহিনীকে এরূপ যুদ্ধনৈপুণ্য, আক্রমণ সহ্য ও প্রতিহত করিবার শক্তি, এবং প্রতি-আক্রমণ করিবার সাহস দেখাইতে হইবে যাহাতে সম্পূর্ণ ভাবে জয়লাভ করিতে না পারিলেও শত্রুকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জোর দেওয়া হইল দুইটি জিনিষের উপর,—প্রথমত জার্ম্মান নৌবাহিনীর ট্যাক্টিক্যাল শিক্ষায়; দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ জাহাজের গঠনে। গত যুদ্ধে এবং তাহার পূর্ব্বে নূতন জার্ম্মান নৌবাহিনীর যে সকল লক্ষণ সকলেরই চোখে পড়িয়াছিল সেগুলি এই—(১) জার্ম্মান নৌ-সেনা ও সেনাপতিদের রণোৎসাহ (ট্যাক্টিক্যাল উইল টু ব্যাটল্); (২) কামান দাগা ও লক্ষ্যভেদে উৎকর্ষ; (৩) প্রণিধানের মজবুত গঠন; (৪) গোলার ও লক্ষ্য করিবার যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সবগুলি গুণই 'ট্যাক্টিক্স'-এর অন্তর্ভুক্ত। টিরপিটসের নূতন রণনীতি হইতেই উহাদের উদ্ভব ও 'রিস্ক-থিওরী'র সহিত ইহাদের সবগুলিই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

'রিস্ক-থিওরী' অবলম্বনে জার্ম্মান নৌবাহিনীর ট্যাক্টিক্সের উৎকর্ষ হইল বটে, কিন্তু স্ট্র্যাটেজির দিক হইতে অসুবিধা হইল। যে 'অফেন্সিভ'কে ৯নং মেমোরেণ্ডামে টিরপিটস্ নৌযুদ্ধে সাফল্যলাভের প্রধান উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, নূতন রণনীতি অবলম্বনের ফলে জার্ম্মান নৌবাহিনীকে উহার আশা ছাড়িয়া স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হইতে হইল, অর্থাৎ স্বেচ্ছায় ও নিজের উদ্যোগে ইংরেজকে আক্রমণ করিবার উপায় রহিল না, নির্ভর করিতে হইল ইংরেজের উপর—যদি সে জার্ম্মান বাহিনীকে আক্রমণ করিতে আসে। টিরপিটস্ ও অন্য জার্ম্মান সেনাপতিরা ধরিয়া লইয়াছিলেন, যুদ্ধ বাধিলেই ইংরেজের নৌবহর জার্ম্মেনির উপকূলের কাছে আসিয়া তাঁহাদের আক্রমণ করিবে। সুতরাং ইংরেজ নৌবাহিনীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আক্রমণ করিবার কল্পনা তাঁহারা ত্যাগ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, সংখ্যার অল্পতা ছাড়া গঠনেও জার্ম্মান যুদ্ধ জাহাজগুলিকে এমন করা হইল যে তাহাদের পক্ষে ঘাটি ছাড়িয়া বেশী দূরে যাওয়া সম্ভব রহিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়িয়া শুধু টিঁকিয়া থাকা নয়—উহাকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্য থাকায় জাহাজগুলিকে ভারী বর্ম্মে আবৃত করিতে হইল। সব জাহাজেরই আয়তনের সীমা আছে, উহাদিগকে সকল দিক হইতে সমান শক্তিশালী করা সম্ভব হয় না, সেজন্য বর্ম্ম বেশী দিতে গিয়া কয়লা ও খাদ্যদ্রব্যাদি

লইবার জায়গার সঙ্কোচ করিতে হইল, উহাতে জার্ম্মান যুদ্ধ জাহাজগুলির পাল্লা অপেক্ষাকৃত কম হইয়া দাঁড়াইল।

কার্য্যক্ষেত্রে টিরপিটসের 'রিস্ক থিওরী'র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল, জার্ম্মান নৌবাহিনীর ভয় ১৯১৪ সালে ইংরেজকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিতে পারে নাই। সামরিক ব্যাপারেও 'রিস্ক-থিওরী'র মূল হিসাব ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, ইংরেজ নৌবহর যুদ্ধং দেহি বলিয়া হেলিগোল্যাণ্ডে অগ্রসর না হইয়া সুদূর স্কাপা ফ্লো হইতে জার্ম্মেনির বাণিজ্য এবং জার্ম্মান যুদ্ধ ও বাণিজ্য জাহাজের আগমন নির্গমনের পথ বন্ধ করিয়া রহিল। অবশ্য গত যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনী 'নর্থ সি'তে যে একেবারে আসে নাই তাহা নয়, মাঝে মাঝে আসিয়া চারিদিক দেখিয়া গিয়াছে, জার্ম্মান নৌবাহিনী বাহির হইয়া আসিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া কখনও কখনও উহাকে বাধা দিতে আসিয়াছে, একবার হেলিগোল্যাণ্ড বাইটে আসিয়া আক্রমণও করিয়াছে। এই সকল চলাচল উপলক্ষে ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে হেলিগোল্যাণ্ড বাইটের যুদ্ধ, ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে ডগার ব্যাঙ্কের যুদ্ধ, ও ১৯১৬ সালের মে মাসে জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই সকল যুদ্ধ ও পরিক্রমণকে নিয়মের ব্যতিক্রম বলা উচিত। গ্র্যাণ্ড ফ্লীট সাধারণত মাইন, সাবমেরিন, টর্পেডোবোট-অধ্যুষিত 'নর্থ সি' হইতে দূরে থাকিয়া জার্ম্মেনিকে 'ব্লকেড' করিয়াছে। ব্রিটিশ নৌবাহিনী গতযুদ্ধে জার্ম্মেনির পরাজয়ের একটি মুখ্য হেতু, সে বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু ব্রিটিশ নৌবাহিনী হইতে এই ফল ঘটিয়াছে ব্লকেডের দ্বারা, নৌযুদ্ধের দ্বারা নয়।

ব্রিটিশ নৌবাহিনীর এই অচিন্তিতপূর্ব্ব আচরণে জার্ম্মান নৌবাহিনীর সমূহ অসুবিধা ঘটিল। অবশ্য এরূপ একটা সম্ভাবনার কথা যুদ্ধের আগেও টিরপিটসের মনে যে জাগে নাই তাহা নয়। যুদ্ধ বাধিবার মাস তিনেক পূর্ব্বে টিরপিটস্ এক দিন জার্ম্মান নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ আডমিরাল ইনগেনোলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"যদি ইংরেজরা শেষ পর্য্যন্ত না আসে, তাহা হইলে কি হইবে?" ইনগেনোল তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই, টিরপিটস্ নিজেও কোন সন্তোষজনক উত্তর বাহির করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজ নৌবহর এইরূপ একটা পথ ধরিয়া বসিলে টিরপিটসের সমগ্র নৌনীতি এরূপ ভাবে ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা ছিল যে, এই সন্দেহকে তিনি মনে স্থান দিতেও প্রস্তুত ছিলেন না; তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মীরা এই আশায় শেষ পর্য্যন্ত বসিয়াছিলেন যে, ইংরেজ নিশ্চয়ই আসিবে।

আগেই বলিয়াছি, কার্য্যত ইংরেজ আসিল না, ইহাতে জার্ম্মান নৌবহরের যে অসুবিধা ঘটিয়াছিল উহাই পরিণামে তাহার পরাজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। জার্ম্মান নৌবহর সংখ্যায় বা গঠনে এরূপ ছিল না যে, স্কাপা ফ্লোর দিকে অগ্রসর

হইয়া সমগ্র গ্র্যাণ্ড ফ্লীটকে আক্রমণ করিতে পারে। যে যুদ্ধের জন্য জার্মান নৌবাহিনী নির্মিত হইয়াছিল, উহার রণনীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, যাহার জন্য নৌ-সেনা অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল সে যুদ্ধের সুযোগ আসিল না, জার্মান নৌবাহিনীকে ব্রিটিশ ব্লকেডের মুখে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হইল। তখন জার্মান নৌ-সেনাপতিদের এবং বিশেষ উহাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা কৃতী এবং উদ্যমশীল ছিলেন সেই আডমিরাল শেয়ারের একমাত্র চিন্তা দাঁড়াইল কি করিয়া ব্রিটিশ নৌবহরকে 'নর্থ সি'তে আনিয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে বিনষ্ট করা যায়। ইহার জন্য তাঁহারা ইংলণ্ডের পূর্ব উপকূল আক্রমণ করিলেন, নরওয়ে হইতে স্কটল্যাণ্ডে যে 'কনভয়' যাওয়া আসা করিত উহাদের আক্রমণ করিয়া দুইবার ডুবাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রিটিশ নৌবহরকে কিস্তিতে কিস্তিতে নষ্ট করিয়া 'কমাণ্ড অফ দি সি' ছিনাইয়া লইবার সুযোগ ঘটিল না, একবার ভিন্ন ভাল করিয়া যুদ্ধের সুযোগও মিলিল না এবং এই একটি সুযোগ যখন মিলিল তখনও তিন ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র গ্র্যাণ্ড ফ্লীট আসিয়া উপস্থিত হইয়া জার্মান নৌবহরকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিল। এই নিশ্চেষ্টতাই জার্মান নৌ-সেনার মধ্যে অবসাদ ও অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ। ১৯১৮ সনের অক্টোবর মাসে উহা প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ ধরিয়া দেখা দিল। ইহা অপেক্ষাও শোচনীয় পরিণাম স্বচক্ষে দেখা টিরপিটসের অদৃষ্টে ছিল। যুদ্ধবিরতির সর্তানুযায়ী প্রায় সমগ্র জার্মান নৌবাহিনীকে অক্ষত অবস্থায় ব্রিটিশ বন্দরে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইল।

৩

বহু আশায় জার্মান নৌবাহিনী নির্মিত হইয়াছিল। ১৯১৪—১৮ সনের যুদ্ধে এই আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়াতে জার্মান নৌ-সেনা ও সাধারণের মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহারই ফলে ক্রুজে যে বিপ্লবের কথা বলিয়াছিলেন উহার উদ্ভব হইয়াছে। ভের্সাই সন্ধির পরবর্তী যুগের নৌবাহিনী বলিতে কিছুই না থাকাতে ঐতিহাসিক আলোচনা ভিন্ন অন্য পথ ধরিবার উপায় ছিল না। আবার যখন নূতন জার্মান নৌবাহিনীর সৃষ্টি হইল তখনও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করিবার জন্য অতীত হইতে সূত্র সংগ্রহ করা আবশ্যক হইল, এই দুই কারণেই গত যুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা এবং রচনাকে অবলম্বন করিয়াই নূতন জার্মান নৌযুদ্ধনীতি আত্মপ্রকাশ করিল। এই নূতন নীতির সৃষ্টি এবং বিকাশে যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গত যুদ্ধের জার্মান সরকারী ইতিহাসের নৌখণ্ডের সম্পাদক আডমিরাল গ্রোস, আডমিরাল হেগেনার, ক্যাপটেন ক্লাউসেন, কমাণ্ডার গ্রাসমান, ক্যাপটেন হ্বালডায়ার হার্টস্, এর্ণষ্ট হিলহেলম্ ক্রুজে প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইহাদের মধ্যেও আবার আডমিরাল হেগেনারের স্থানই সর্বোচ্চে। ১৯২৬ সনে "বিশ্বযুদ্ধের নৌনীতি" এই নাম দিয়া তিনি যে সমালোচনা প্রকাশ করেন উহা হইতে এবং এই সমালোচনাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে বাদপ্রতিবাদ আরম্ভ হয় উহার দ্বারা নূতন জার্মান নৌযুদ্ধনীতির উৎপত্তি হইয়াছে বলা চলে। উর্দ্ধতন নৌ-সেনাপতিরা আডমিরাল হেগেনারের সিদ্ধান্তের অনুমোদন না করিলেও অল্পবয়স্ক নায়কেরা উহার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ক্যাপ্টেন ক্লাউসেন লিখিয়াছেন, "যে আলোচনায় নৌ-সেনাপতিদের অনেকেই বর্তমানে ব্যগ্রভাবে আসিয়া যোগ দিতেছেন, নৌযুদ্ধের উচ্চতম নীতির এই আলোচনার প্রেরণা জোগাইয়াছেন ভাইস-আডমিরাল হেগেনার। ইহা সসম্মানে এবং কর্তব্যের খাতিরে অবশ্যস্বীকার্য।"

এই সকল আলোচনা হইতে প্রথম ও প্রধান যে সিদ্ধান্ত দেখা দেয় তাহা সংক্ষেপে এই—জার্মান নৌবাহিনী গত যুদ্ধে সমুদ্রপথে প্রাধান্য লাভ করিতে গিয়া 'গ্র্যাণ্ড ফ্লীটে'র উপরই যে একান্তভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, উহাই তাহার সর্বাপেক্ষা বড় ভুল। ইহার ফলে সে সংখ্যাগরিষ্ঠ 'গ্র্যাণ্ড ফ্লীটে'র সহিত যুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য কোন করণীয় বাহির করিতে পারে নাই, কি করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্র্যাণ্ড ফ্লীটকে সংখ্যালঘিষ্ঠ করা যায় উহার চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করিবার অবকাশ পায় নাই, যুদ্ধ ভিন্ন অন্য পথও যে নৌবাহিনীর সম্মুখে উন্মুক্ত থাকিতে পারে উহা তাহার মনে জাগে নাই। আডমিরাল হেগেনার ও তাঁহার সমধর্মীরা বলেন, নৌবাহিনীর মুখ্য কর্তব্য জলপথে নিজের চলাচল অব্যাহত রাখা ও শত্রুর চলাচল বন্ধ করা; উহার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য বা অন্য কোন প্রকারের প্রাবল্যের জন্য যুদ্ধ করা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে এই মূল কর্তব্য সাধন করিবার অন্য গৌণ উপায়ও আছে, উহাই অবলম্বন করিতে হইবে, যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; গত যুদ্ধে জার্মান নৌ-সেনাপতিরা ইহা বুঝিতে পারেন নাই এবং অন্য পথ ধরেন নাই, উহাই তাঁহাদের ব্যর্থতার কারণ।

আর কি উপায় ছিল?—এই প্রশ্নের উত্তরে আডমিরাল হেগেনার লিখিয়াছেন, জার্মান নৌ-সেনাপতিদের উচিত ছিল নর্থ সিতে গ্র্যাণ্ড ফ্লীটের প্রত্যাশায় বসিয়া না থাকিয়া নরওয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া যাওয়া, এবং গ্র্যাণ্ড ফ্লীটকে আক্রমণ বা অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করা। এই উদ্যম সফল হইবার সম্ভাবনা ছিল কি ছিল না এই বিষয়ে জার্মান নৌ-সেনাপতিদের মধ্যে মতের অনৈক্য আছে, কিন্তু কেবলমাত্র গত যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিয়া ভবিষ্যৎ

বিবেচনা করিলে ইহাদের সকলেই প্রায় স্বীকার করেন, প্রবলতর শত্রুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া "সপ্ত সিন্ধু"তে ছড়াইয়া যাওয়া ও প্রতিপক্ষের জলযাত্রা বিপন্ন করিয়া তোলাই জার্ম্মান নৌবাহিনীর যুদ্ধনীতি হওয়া উচিত। এক কথায় বলা চলে, প্রতিপক্ষের নৌবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া বা যথাসম্ভব কম যুদ্ধ করিয়া বাণিজ্যযুদ্ধ করাই নূতন জার্ম্মান নৌযুদ্ধনীতির মূল সূত্র। এই লক্ষ্য-পরিবর্ত্তনকেই ক্রুজে নৌযুদ্ধনীতির বিপ্লব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই যুক্তির মধ্যে কোথায় ফাঁক রহিয়াছে তাহা পরে বলা হইবে। কিন্তু এইখানে নূতন নৌযুদ্ধনীতির আরও একটু বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সনে প্রকাশিত ক্যাপটেন হ্বালডেয়ার হার্টসের একটি প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে।

লেখক বলিতেছেন, "ভবিষ্যৎ নৌযুদ্ধবিদ্ আর একমাত্র সামরিক লক্ষ্য বিবেচনা করিয়াই নিজের প্ল্যান করিবেন না; পক্ষান্তরে তিনি নিজেকে এবং নিজের অধীনস্থ বাহিনীকে প্রধানত বাণিজ্যযুদ্ধের কাজে নিয়োজিত করিবেন। এই অনুমান যদি সত্য হয়—এবং সত্য হইবার বহু লক্ষণ দেখা যাইতেছে—তাহা হইলে বাণিজ্যযুদ্ধই ভবিষ্যৎ নৌযুদ্ধের প্রধান রূপ হিসাবে দেখা দিবে।......আজিকার 'ব্লু-ওয়াটার স্কুল' (সমুদ্রপন্থীরা) পালতোলা জাহাজের যুগের 'স্কুল' হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শত্রুপক্ষের যুদ্ধ জাহাজকে খুঁজিয়া বাহির করাই সে যুগে নৌযুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত, বাণিজ্য রক্ষা এবং বাণিজ্য আক্রমণকে গৌণ কৃত্য বলিয়া মনে করা হইত। ভবিষ্যতে দ্বিতীয়টি মুখ্য এবং প্রথমটি গৌণ বলিয়া গণ্য হইবে। সমুদ্রগামী বল নিরপেক্ষ দেশকে সন্ত্রস্ত এবং আয়ত্তাধীন রাখার জন্য প্রযুক্ত হইবে; নিজেদের যুদ্ধজাহাজের যথা সম্ভব কম ক্ষতি করিয়া যাহাতে বিপক্ষের বাণিজ্যবহরকে অচল করা যায় কিংবা—যাহা আরও বাঞ্ছনীয়—বিনষ্ট করা যায় এই উদ্দেশ্যেই নৌযুদ্ধনীতি নিয়ন্ত্রিত হইবে; প্রতিপক্ষের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে আর অভিযান হইবে না, হইবে তাহার আর্থিক শক্তি ও সম্বলের বিরুদ্ধে; এক কথায়, পূর্ব্বে নৌযুদ্ধনীতির একমাত্র লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ ও সংঘর্ষ (এই প্রসঙ্গে আবুকার ও ট্রাফালগারের দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে)—ভবিষ্যতে উহাদের দেখা যাইবে বাণিজ্য যুদ্ধের আনুষঙ্গিক হিসাবে। আজিকার 'ব্লু-ওয়াটার স্কুলে'র অর্থ বাণিজ্য-যুদ্ধ—বাণিজ্য যুদ্ধের প্রবলতম রূপ।...... শত্রুর বাণিজ্য আক্রমণ ও নিজের বাণিজ্য রক্ষা, এই দুই লক্ষ্যের তুলনায় অন্য সকল কর্ত্তব্য গৌণ বলিয়া মনে করা হইবে...যেহেতু নৌযুদ্ধে বাণিজ্য জাহাজ বিচ্ছিন্নভাবে থাকিবে, সেইজন্য ভবিষ্যতের নৌযুদ্ধ একসঙ্গে সকল সমুদ্রে চলিতে থাকিবে, এবং এই যুদ্ধ সেই সকল স্থানেই প্রচণ্ডতমরূপে দেখা দিবে যেখানে বাণিজ্যপথ আসিয়া

বেশী সংখ্যায় মিলিত হইয়াছে।...যুদ্ধ জাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজের প্রভেদ ঘুচিয়া যাইবে। দুইই এককালে আক্রমণকারী ও রক্ষাকারী হইয়া দাঁড়াইবে।"

এই কয়েকটি কথাতেই নব্য জার্ম্মান নৌযুদ্ধনীতি এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, উহার সম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অনেকেরই মনে হয়ত প্রশ্ন জাগিবে—সংখ্যান্যূনতার জন্য জার্ম্মান নৌবাহিনী যদি ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে আক্রমণ করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই সংখ্যান্যূনতা লইয়াই সে জলপথের সর্ব্বত্র ব্রিটিশ বাণিজ্যবহর কি করিয়া আক্রমণ করিবে? এই সকল বাণিজ্যবহর কি প্রবলতর ব্রিটিশ নৌবহরের দ্বারা রক্ষিত হইবে না? বাণিজ্য জাহাজ নষ্ট করিতে গেলে কি যুদ্ধ জাহাজের সম্মুখীন হইতে হইবে না? এই আপত্তির পিছনে সত্য অনেকটা আছে, কিন্তু নৌযুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্যের জন্য উহা সর্ব্বাংশে সত্য নয়। জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধের মধ্যে তারতম্য এই যে, দ্বিতীয়টিতে দুর্ব্বল পক্ষ আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারে কিন্তু আক্রমণ করিতে পারে না, প্রথমটিতে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থার উদ্ভব হয়—অর্থাৎ জলযুদ্ধে দুর্ব্বল পক্ষ আক্রমণ বরঞ্চ করিতে পারে, কিন্তু আত্মরক্ষার শক্তি বহুল পরিমাণে হারাইয়া ফেলে। ইহার কারণ খুব সহজ। জলযুদ্ধে আত্মরক্ষার অর্থ নৌবহর দ্বারা জলপথে চলাচল অব্যাহত রাখা ও দেশের উপকূল রক্ষা। এই দুইটি কাজের জন্য নৌবহরকে একই সময়ে নানা স্থানে উপস্থিত থাকিতে হয়, সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হয়; এইভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে প্রবলতর শত্রুর হাতে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী; এইজন্য নৌবাহিনীর প্রধান দুইটি 'ডিফেন্সিভ' কর্ত্তব্য সমাপন দুর্ব্বল বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু সে অবিচ্ছিন্ন ও একত্রিত থাকিয়া, নিজের সময় ও সুবিধা মত যে কোন একটি লক্ষ্য বাছিয়া লইয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য সমস্ত শক্তি একবারে প্রয়োগ করিতে পারে। নিজের বাণিজ্য চলাচল বজায় রাখিবার জন্য, বাণিজ্য পোত রক্ষা করিবার জন্য, উপকূল রক্ষা করিবার জন্য, বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য প্রবলতর নৌবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন হইতে হয় বলিয়া তাহার উপর এইরূপ আক্রমণ সফল হইবার বেশ সম্ভাবনা থাকে; বিশেষত প্রবল নৌবাহিনী যদি প্রতিপক্ষের নৌবাহিনীর তুলনায় খুব বেশী বড় না হয়, তাহা হইলে বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশীই হইয়া দাঁড়ায়। নৌযুদ্ধে এই ব্যাপারটা ঘটিতে পারে বলিয়াই উহাতে দুর্ব্বল পক্ষের আক্রমণের শক্তির হ্রাস আত্মরক্ষার শক্তির হ্রাসের অনুপাতে কম হয়।

ইংরেজ-জার্ম্মান প্রতিযোগিতায় দুর্ব্বলতর জার্ম্মান নৌবাহিনীর পরিচালকগণের এই কথাটা বুঝিতে বেশী দেরী হয় নাই। যে এর্ণষ্ট হ্বিল্‌হেল্‌ম্ ক্রুজের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তিনি বলিতেছেন,—

"জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধের অবস্থা পরস্পরবিরোধী। জলপথে প্রবলতর পক্ষকে প্রায়ই 'ডিফেন্সিভ' নীতি অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু দুর্ব্বলতর পক্ষ 'অফেন্সিভে'র পক্ষপাতী হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, প্রবল পক্ষের সমুদ্রে চলাচলের পথ সাধারণত বহুবিস্তীর্ণ হয়। একমাত্র যদি প্রবল পক্ষের সমুদ্র চলাচলের প্রয়োজন গুরুতর না হয় এবং চলাচল বহুবিস্তীর্ণ না হয় তবেই দুই পক্ষের শক্তির এই অনুপাতের ব্যতিক্রম হইতে পারে। নৌযুদ্ধে দুর্ব্বল বাহিনীর পক্ষে প্রবলতর বাহিনীর 'ডিফেন্সিভ' ব্যবস্থাকে আক্রমণ করিবার এত সুযোগ ঘটে যে, ইহার জন্যই দুর্ব্বল পক্ষ 'অফেন্সিভ' অবলম্বন করিতে প্ররোচিত হয়। এই ব্যাপারটাও নৌযুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্য। নৌযুদ্ধে 'অফেন্সিভে'র শক্তি এই জন্য বেশী হইয়া দাঁড়ায় যে, আক্রমণকারী নিজের সমস্ত বল একত্রিত করিয়া অপর পক্ষের বলের একটি অংশকে আক্রমণ করিতে পারে, অথচ এই আক্রমণ কোন দিক হইতে আসিবে অপর পক্ষ তাহা সময় মত বুঝিতে পারে না এবং এই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য নিজের বল একত্রিত করিবার সময় পায় না।"

এই যুক্তির মধ্যে অতিশয়োক্তি খানিকটা হয়ত আছে। কিন্তু মোটের উপর উহাকে ভিত্তিহীন বা কাল্পনিক বলা চলে না। এই জন্যই দুর্ব্বল হইয়াও জার্ম্মান নৌবহর ব্রিটেনের বাণিজ্য চলাচল বন্ধ করিবার এবং সপ্ত সিন্ধুতে এককালে ব্রিটিশ বাণিজ্য বহরকে আক্রমণ করিবার সংকল্প করিতে পারিয়াছে, কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টাকেও অসম্ভব মনে করে নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মান নৌবল প্রয়োগের যে সূত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান যুদ্ধে কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা কতদূর সফল হইয়াছে ও কতদূর হয় নাই, এবং সাফল্য অসাফল্যের কারণ কি ও কোথায়—উহাই এখন বিচার্য্য।

(আগামীবারে সমাপ্য)

পরিশিষ্ট

(ক) রণতরী ও বিমানের সংঘর্ষে ট্যাক্টিকাল ফলাফল

তারিখ	আক্রমণকারী	স্থান ও লক্ষ্য	আক্রমণকারীর সংখ্যা ও ক্ষতি	আক্রান্তের ক্ষতি
৪।৯।৩৯	ব্রিটিশ-বিমানবাহিনী	হিলিগোল্যাণ্ড, বাইট ও ক্রনসবুটেল।	অপ্রকাশিত ; সম্ভবত ১৫ খানার বেশী নয় ; অন্তত ৫ খানা নষ্ট।	দুইখানি পকেট ব্যাটল্শিপের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত, কিন্তু কয়েক মাস পরে উহাদিগকে অন্যত্র দেখা গিয়াছে।
২৬।৯।৩৯	জার্ম্মান বিমান বহর	নর্থ-সি ; নরওয়ের উপকূল হইতে দেড়শত মাইল দূরে 'হোম ফ্লীটে'র উপর।	অপ্রকাশিত ; ২ খানা নষ্ট	ব্যর্থ ; একখানি এয়ারক্রাফ্ট্-ক্যারিয়ার নিমজ্জিত ও একখানি ব্যাটল্শিপ জখম বলিয়া জার্ম্মান পক্ষ হইতে প্রচার করা হয় ; কিন্তু এই দাবি ভিত্তিহীন।
২৯।৯।৩৯	ব্রিটিশ	হেলিগোল্যাণ্ড বাইট ; জার্ম্মান রণতরী।	অপ্রকাশিত ; অন্তত ৫ খানা নষ্ট।	ফলাফল প্রকাশিত হয় নাই ; ব্যর্থ বলিয়া অনুমিত।
১৬।১০।৩৯	জার্ম্মান	ফার্থ অফ্ ফোর্থ ; ব্রিটিশ রণতরী।	সম্ভবত ১২-১৪ খানা ; ৪ খানা নষ্ট।	একখানি ডেষ্ট্রয়ার জখম ; দুইখানি ক্রুজারে লোক হতাহত।
১৭।১০।৩৯	জার্ম্মান	স্কাপা ফ্লো ; ব্রিটিশ রণতরী ও নৌঘাঁটি।	দুইবারে আক্রমণ ; সংখ্যা প্রতিবারে ১৪।১৫ খানার বেশী নয় ; ২ খানা নষ্ট।	পুরাতন ও নিরস্ত্রীকৃত ব্যাটলশিপ 'আয়রন ডিউক' জখম।
২১।১০।৩৯	জার্ম্মান	নর্থ সি ; ব্রিটিশ বাণিজ্য কনভয়।	১২ খানা ; ৭ খানা নষ্ট।	ব্যর্থ।

পরিশিষ্ট

(ক) রণতরী ও বিমানের সংঘর্ষে 'ট্যাক্টিকাল' ফলাফল (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তারিখ	আক্রমণকারী	স্থান ও লক্ষ্য	আক্রমণকারীর সংখ্যা ও ক্ষতি	আক্রান্তের ক্ষতি
৩।১২।৩৯	ব্রিটিশ	হেলিগোল্যাণ্ড ; জার্ম্মান রণতরী।	আন্দাজ ২০ খানা ; নষ্ট হয় নাই।	অনিশ্চিত।
২৭।১২।৩৯	ব্রিটিশ	জার্ম্মান উপকূল	১ খানা ; নষ্ট হয় নাই।	অনিশ্চিত।
১৬।৩।৪০	জার্ম্মান	স্কাপা ফ্লো ; ব্রিটিশ নৌ-বহর ও ঘাঁটি	১৪ খানা ; সম্ভবত দুইখানি	একখানি ক্রুজার সামান্য জখম।
৮।৪।৪০	জার্ম্মান	স্কাপা ফ্লো ; ব্রিটিশ নৌ-বহর	অপ্রকাশিত ; ৩ খানি	ব্যর্থ।
৯।৪।৪০	জার্ম্মান	বের্গেনের নিকট নরওয়ের উপকূল ; ব্রিটিশ হোম ফ্লীট।	৫০-৬০ ; ক্ষতি অপ্রকাশিত	১ খানি ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত ; ২ খানি ক্রুজার জখম ; ব্যাটলশিপ 'রডনের' উপর বোমা পড়িয়াছিল কিন্তু যুদ্ধ বার ক্ষমতার হ্রাস হয় নাই।
৯-১০।৪।৪০	ব্রিটিশ	বের্গেন ফিয়র্ড, জার্ম্মান ক্রুজার	২৪ খানা ; ক্ষতি হয় নাই	১ খানি ক্রুজার নিমজ্জিত।
১০।৪।৪০	জার্ম্মান	স্কাপা ফ্লো ; ব্রিটিশ নৌ-বহর	আন্দাজ ৬০ খানা ; ৭ খানা	ব্যর্থ।

পরিশিষ্ট

(ক) রণতরী ও বিমানের সংঘর্ষে 'ট্যাক্টিকাল' ফলাফল (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তারিখ	আক্রমণকারী	স্থান ও লক্ষ্য	আক্রমণকারীরসংখ্যা ও ক্ষতি	আক্রান্তের ক্ষতি
১১।৪।৪০	ব্রিটিশ	ট্রনড্‌হাইম ; জার্ম্মান যুদ্ধ জাহাজ	অপ্রকাশিত ; ক্ষতি হয় নাই	১ খানি ডেষ্ট্রয়ার জখম, সম্ভবত নিমজ্জিত
১২।৪।৪০	ব্রিটিশ	বের্গেন ; জার্ম্মান যুদ্ধ ও বাণিজ্য জাহাজ	অপ্রকাশিত ; ১ খানি	৩ খানি বাণিজ্য জাহাজ জখম।
১৩।৪।৪০	জার্ম্মান	ষ্টাভাঙ্গার ; ব্রিটিশ ক্রুজার	অনেক ; অপ্রকাশিত	১ খানি ক্রুজার সামান্য জখম।
১৬।৪।৪০	জার্ম্মান	নরওয়ের উপকূল, ব্রিটিশ ডেষ্ট্রয়ার	৬ খানা ; ক্ষতি হয় নাই	ব্যর্থ।
২০-৩০।৪।৪০	জার্ম্মান	নরওয়ের উপকূল ; ব্রিটিশ ফরাসী ও পোলিশ যুদ্ধ ও বাণিজ্য জাহাজ	অপ্রকাশিত ; (সম্ভবত অনেক)	৩ খানি ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত ; ১ খানি ছোট ক্রুজার জখম ও নিমজ্জিত।
৯-১৪।৫।৪০	জার্ম্মান	ডচ্ উপকূল ; ব্রিটিশ ও ফরাসী নৌ-বহর	অপ্রকাশিত ; (সম্ভবত অনেক)	২ খানি ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত ; ১ খানি গুরুতর জখম।

পরিশিষ্ট

(ক) রণতরী ও বিমানের সংঘর্ষে 'ট্যাক্টিকাল' ফলাফল (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তারিখ	আক্রমণকারী	স্থান ও লক্ষ্য	আক্রমণকারীর সংখ্যা ও ক্ষতি	আক্রান্তের ক্ষতি
২৯।৫-২।৬।৪০	জার্ম্মান	ডুনকার্ক ; ব্রিটিশ বি, ই, এফ্‌-এর অপসরণে বাধা।	অনেক ; অপ্রকাশিত	৬ খানি ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত।
১১।৬।৪০	ব্রিটিশ	ট্রণ্ডহাইম ফিয়র্ড ; জার্ম্মান নৌবহর।	অপ্রকাশিত ; ২টি নষ্ট	২ খানা ক্রুজার জখম।
১৩।৬।৪০	ব্রিটিশ	ট্রণ্ডহাইম ফিয়র্ড ; ব্যাটলক্রুজার শার্ণ-হোষ্ট	অপ্রকাশিত	শার্ণহোর্ষ্ট জখম।
২০।৬।৪০	ব্রিটিশ	নরওয়ের উপকূল ; শার্ণহোর্ষ্ট ও অন্যান্য যুদ্ধজাহাজ	অপ্রকাশিত ; ৫ খানি নষ্ট	শার্ণহোর্ষ্ট ও ১ খানি ডেষ্ট্রয়ার জখম।
১-২।৭।৪০	ব্রিটিশ	কীল বন্দর	অপ্রকাশিত	শার্ণহোর্ষ্ট জখম।
৬।৭।৪০	ব্রিটিশ	তোব্রুক বন্দর ; ইটালিয়ান যুদ্ধজাহাজ	অপ্রকাশিত	একটি বড় ক্রুজার জখম।
৮-৯-১০।৭।৪০	ইটালিয়ান	ভূমধ্যসাগর ; ব্রিটিশ নৌবহর	অনেক ; ৯ খানি নষ্ট	একখানা ক্রুজার সামান্য জখম।

পরিশিষ্ট

(ক) রণতরী ও বিমানের সংঘর্ষে 'ট্যাক্টিকাল' ফলাফল (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তারিখ	আক্রমণকারী	স্থান ও লক্ষ্য	আক্রমণকারীর সংখ্যা ও ক্ষতি	আক্রান্তের ক্ষতি
১০।৭।৪০	ব্রিটিশ	ভূমধ্যসাগর ; ইটালিয়ান নৌবহর	অপ্রকাশিত	একখানি ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত ; একখানি ক্রুজার জখম।
২।৮।৪০	ইটালিয়ান	ভূমধ্যসাগর ; ব্রিটিশ নৌবহর	অনেক ; ৩ খানি নষ্ট	ব্যর্থ।
১০-১১।১১।৪০	ব্রিটিশ	তারান্তো ; ইটালিয়ান নৌবহর	অপ্রকাশিত তবে বেশী নয় ; ২ খানি নষ্ট	৩ খানি ব্যাটলশিপ ও ২ খানি ক্রুজার গুরুতর জখম।
২৭।১১।৪০	ব্রিটিশ	সার্দ্দিনিয়া ও নেপল্‌সের মধ্যবর্ত্তী ভূমধ্যসাগর ; ইটালিয়ান যুদ্ধজাহাজ	অপ্রকাশিত	১ খানি ব্যাটলশিপ ও অন্য ক্রুজার জখম।
১০।১।৪১	জার্ম্মান	ভূমধ্যসাগর ; ব্রিটিশ নৌবহর	আন্দাজ ১০০ শত ; ১২ খানি নষ্ট	১ খানি এয়ারক্র্যাফ্‌ট-ক্যারিয়ার গুরুতর জখম ; একখানি ক্রুজার গুরুতর জখম ও পরে নিমজ্জিত ; একখানি ডেষ্ট্রয়ার জখম।
২০-২২।২।৪১	জার্ম্মান	ভূমধ্যসাগর ; ব্রিটিশ নৌবহর	অপ্রকাশিত	ব্যর্থ।

দ্রষ্টব্য—এই তালিকায় ডেষ্ট্রয়ার, সাবমেরিন বা অন্য ছোট যুদ্ধজাহাজের উপর আক্রমণের উল্লেখ করা হয় নাই ; বাণিজ্য জাহাজের উপর আক্রমণ এবং অন্য ছোট ছোট কয়েকটি আক্রমণও বাদ দেওয়া হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

(খ) নৌবল বনাম বিমানবল—ষ্ট্র্যাটেজিকাল ফলাফল

(১) নরওয়ের পশ্চিম উপকূল

১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসে নরওয়ে আক্রান্ত হওয়ার পর অকুস্থলে বিমানবলে জার্ম্মেনির প্রাধান্ত থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ নৌবহরের পক্ষে নরওয়েতে অভিযান লইয়া যাওয়া, অভিযান ফিরাইয়া আনা, নরওয়ের উপকূলে জার্ম্মান নৌবহরকে আক্রমণ করা অসম্ভব হয় নাই। এই সকল ব্যাপারে ব্রিটিশ নৌবহরের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ক্ষতি (এয়ারক্র্যাফ্‌ট-ক্যারিয়ার গ্লোরিয়াস-এর নিমজ্জন) জার্ম্মান নৌবহর হইতে হইয়াছে; বিমান আক্রমণ হইতে একখানি ক্রুজার, কয়েকখানা ডেষ্ট্রয়ার ও অন্ত ছোট যুদ্ধজাহাজ নষ্ট হইয়াছে।

(২) স্কাগারর‍্যাক ও কাটেগাট

নরওয়ে আক্রমণের পর জার্ম্মেনি ও নরওয়ের মধ্যে সৈন্ত ও জাহাজ চলাচল বন্ধ করিবার জন্ত এক সাবমেরিন ভিন্ন অন্ত জাহাজ স্কাগারর‍্যাক ও কাটেগাটে পাঠান ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। জার্ম্মান বিমানবলের প্রাধান্তই উহার কারণ বলিয়া মিঃ চার্চ্চিল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

(৩) নর্থ সি

যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে গত এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত নর্থ সি-তে ব্রিটিশ বাণিজ্য বহর ও নৌবহরের চলাচল বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই; কিন্তু হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ও ফ্রান্সের উপকূল জার্ম্মান অধিকারে আসার পর হইতে এই চলাচল পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কুচিত হইয়াছে।

(৪) ইংলিশ চ্যানেল ও বে অফ্‌ বিস্কে

জার্ম্মান বিমান আক্রমণের জন্ত ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজকে বর্ত্তমানে (অর্থাৎ ফ্রান্সের পরাজয়ের পর) কনভয় গঠন করিয়া লণ্ডনে ও পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ উপকূলের অন্তান্ত বন্দরে আসিতে হয়। এই কারণে এবং ক্ষতির সম্ভাবনা থাকায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভিন্ন অন্ত মালপত্র ইংলিশ চ্যানেলের ভিতর দিয়া জলপথে পাঠান হয় না। বড় জাহাজ ও কনভয় এখন পশ্চিম ও উত্তর দিকের বন্দরে যায়। কিন্তু কনভয়ে করিয়া বহু জাহাজ এখনও লণ্ডন এবং অন্তান্ত বন্দরে পৌঁছিতেছে।

বে অফ্‌ বিস্কেতে দূরপাল্লার এরোপ্লেনের আক্রমণের দ্বারা বাণিজ্য জাহাজের কিছু ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু চলাচল অব্যাহত আছে।

(৫) ভূমধ্যসাগর

গত জুন হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইটালিয়ান বিমানবাহিনী ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নৌবহর ও সৈন্ত চলাচলে বাধা দিতে পারে নাই। জানুয়ারী মাসে জার্ম্মান বিমানবাহিনী সিসিলি দ্বীপে ঘাটি বসাইয়াছে, ও উহার পর হইতে আক্রমণ একটু তীব্র হইয়াছে; কিন্তু চলাচল অব্যাহত আছে।

(৬) সিসিলি ও টিউনিসিয়ার মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ জলপথ

এই জায়গায় জাহাজের চলাচল বিমান আক্রমণের দ্বারা খুবই বিপজ্জনক করা যাইবে বলিয়া সকলেই মনে করিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যত তাহা হয় নাই। একমাত্র জার্ম্মান বিমানবহরের আক্রমণে একদিন তিনখানি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজের ক্ষতি হইয়াছে, তবে সেদিনও কনভয়ের কোন ক্ষতি হয় নাই। বর্ত্তমানে যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্যবাহী জাহাজের চলাচল এই পথ দিয়া প্রয়োজনমত চলিতেছে। সাধারণ বাণিজ্য জাহাজের চলাচল যে ইটালী যুদ্ধ ঘোষণা করার পর হইতেই বন্ধ আছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উহার কারণ ইটালিয়ান নৌবহর ও বিমানবহরের সম্মিলিত আক্রমণের আশঙ্কা।

অনেক দূর সে গৌরী নদীর চরে—

—শ্রীঅশোককুমার মৈত্র

অনেক দূর সে গৌরী নদীর চরে
হেম কুতূহলে পৃথিবী শিয়র
তোলে বর্ষার শেষে,

আমি বসে এই পান্থশালার দ্বারে
বুক ভরে নিই ফরাসী কুয়াশা
ফিকে নীল নিঃশ্বাসে।

স্বপ্নেতে যেন প্রাঙ্গনে জ্বলে
শুক্‌নো পাতার স্তূপ
চারি পাশ ঘিরে ভিড় করে বসা
রাখাল ছেলের রূপ ;

বারে বারে মন উতলা করিছে আজ
শুক্‌নো পাতার সুরভি ধোঁয়ার ঝাঁঝ।
রঙ্গীন বেশের স্রোত বয়ে যায় আমার আসন ঘিরে,
আমার মনের তীরে
ছুটে এসে ভিড়ে লাল সেগুনের ময়ূরপঙ্খী ছিপ
কপালেতে তার জ্বল্ জ্বল্ করে মাজা পয়সার টিপ।
আজ শুক্কুর, হেলে পড়া সেই কৃষ্ণচূড়ার ঘাটে
গাঁয়ের লোকেরা একে একে জোটে হিজলাবটের হাটে,
বেসাতি গুটিয়ে ফিরে গেল তারা পারে,
আমি বসে বসে বিদেশী পথের ধারে
নীড় খুঁজে ফিরি পোড়ো বাড়ীটার কোণে,—
চামচিকা যেথা মিতালি পাতায় ঘরের আঁধার সনে।
বিশ হাত উঁচু গৌরী নদীর 'পাড়ি',
তাহারই উপরে আধভাঙ্গা ঝোলে গুরুনন্দীর বাড়ী,

সদর মহল গিয়েছে নদীর কোলে,
অন্দর তার আর পার দেখে নক্সার চোখ মেলে ;—
আছে কিনা কে বা জানে।
বিদেশী ভাষার অস্ফুট গুঞ্জনে
হঠাৎ চমক ভেঙ্গে যায়, দেখি কখন বসেছে পাশে
তরুণ তরুণী প্রণয়-বিভল,—বিস্মৃত সম্ভাষে।

মৃচ্ছকটিক

সমাজের ব্যয়কুণ্ঠ পণ্য শিষ্টাচার
দৈনন্দিন দাক্ষিণ্যের অপূর্ণ মিলন,
জেনো, সবই সৌরলোকে মৃত্তিকার দান।
শ্রাবণের অর্দ্ধরাত্রে বিনিদ্র শয়নে
মনে কোর, একদিন আদিম কিশোর
ক্ষিপ্রহস্তে কাড়ি তব মনোছদ্মবেশ,
এসেছিল ছিন্ন করে পাষাণ কুঠারে
ঔচিত্য-ভ্রূকুটি ভীত শালীন প্রচ্ছদ,
কামনার পদ্মরাগে সাজাতে তোমায়।
যদি মনে থাকে, অবজ্ঞায় সহ্য ক'র
এ মৃচ্ছকটিক,
মাটির পুতুলে ভরা মন্থরা মেদিনী।

চতুর্দ্দশী—

—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

নগরীর পাকস্থলী জীর্ণ দীর্ণ করেছে আকাশ,
মৃত মৌন সম ভাসে যত গ্রহ তারা।
প্রলাপীর চন্দ্র দেয় পূতিগন্ধী শবের আভাষ।
ছায়াচ্ছন্ন পাদপেরা মরুতাপে হারা।
মননের বেলাভূমি শূণ্য, ক্রূর শ্বাপদসঙ্কুল,
পলায়নে শান্তি নাই। ঘোরে কুম্ভীপাক
পদতলে। তবু চক্ষু তৃপ্তি পায় নয়নে চটুল ;
কামনার ইসারায় তবু হতবাক্।
প্রহরে প্রহরে একই সমারোহে সময় উধাও
ট্রামে বাসে। ভিখারীর শীর্ণ হাতে দিবস মিলন।
সন্নিপাত রোগে মুখে এ জীবন লাগে স্বাদহীন—
—রোমন্থিত দিনগুলি। নিঃশেষ সুধা-ও
দেহ ভাণ্ডে। শুধু শ্রান্ত পদশব্দ গোনা দুর্ণিবার
মৃত্যুর—প্রচণ্ড কোনও সমাপ্তির পরম আঁধার ॥

আদিম আরণ্য শিশু—

—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শতাব্দীর সুপ্তি মাঝে ক্লান্ত তনু ঘুমে অবলীন—
বিস্মৃতি-প্রান্তর হতে অতীতের সেই দিনগুলি
শিথিল স্বপ্নের মাঝে ক্ষণে ক্ষণে বুলায় অঙ্গুলি,
সোনালি দিনের রেখা হল বুঝি দিগন্তে বিলীন।
প্রথম প্রেমের মতো যেই চাঁদ আনিত ইসারা
সে কী আজ মৃতপ্রায়? যান্ত্রিকের বিরাট হতাশা
যন্ত্রের আবর্ত মাঝে অবরুদ্ধ খুঁজে ফেরে ভাষা,
—নগরে বসন্ত আসে: মর্ম্মতলে তবু ও সাহারা!

আদিম আরণ্য শিশু অন্ধকারে খুঁজে ফেরে পথ,
নিশানা হারায়ে গেছে,—মুঠিতে নিশান আছে ঠিক,
অমৃতপায়ীর দল ছত্রভঙ্গ আজ দিগ্বিদিক:
পূর্ব পুরুষের লাগি ক্লান্ত বুঝি পান্থ ভগীরথ।
অশ্রান্ত এ অভিযান থামিবে না তবুও ক্ষণিক
—যাত্রীর পায়ের স্পর্শে কাঁপিবে কী দূর ভবিষ্যৎ?

সনেট

—গোপাল হালদার

১

সৌন্দর্য্যের লক্ষ্মী তুমি, জানি তুমি চিরন্তনী রমা,
তুমি নিখিলের, মহাকাল কোলে তুমি বিজয়িনী
রহিবে শাশ্বত সাক্ষী, রূপে রূপে তুমি নিরুপমা;
মন্থনান্তে বিকশিবে তুমি পুনঃ কল্যাণী-মোহিনী।
জানি আমি এ মন্থন নহে চিরন্তন, নহে সব,
কালের সাগরে শুধু ক্ষণিকের ক্ষুব্ধ আলোড়ন—
নিত্যকাল রহে রূপ, নিত্য রহে গীতির গৌরব,
ছন্দের বন্দিনী তুমি, হে রহসি, মানব জীবন।

সত্য সব। সত্য আরও—দ্বারে আজি আসে যে আহ্বান
দ্বন্দ্ব লয়ে, মৃত্যু লয়ে, লয়ে ত্যাগ; রূঢ় সাধনার
সে ব্রত তোমারি দেওয়া, তোমারি সে উলঙ্গ কৃপাণ
হে রঙ্গিনী প্রাণলীলা! তাই আজি এ বজ্রবীণার
তারে জয়গাথা ঝঙ্কারিত শুনি উল্লসিত প্রাণ,
কর্ম্মের সঙ্গীত ছন্দে গাহি স্তব জীবন-রমার।

২

যখন স্মরিনু মনে আমারো জীবনে একদিন
এসেছিল সুন্দর প্রভাত, বিধাতার আশীর্ব্বাদ
হাতে লয়ে ; আমারেও ডেকেছিল বিস্ময়ে প্রাচীন
তারা আর জলধারা, গিরিশৃঙ্গ, আকাশ অবাধ ;
ধরণীর প্রাণলীলা আমারে মাগিয়াছিল ক্রোড়ে ;
মোর দ্বারে দূত হয়ে এসেছিল নবীন যৌবন,
এসেছিল রূপ, প্রেম ; সাগ্রহে ডাকিয়াছিল মোরে
কবিতা কল্পনা গীতি, ডেকেছিল উদার জীবন—

বিস্ময়ে শুধাই, কোথা আশা, কোথা রূপ, কোথা স্নেহ-
প্রেম-প্রীতি ? সে দিনের ভবিষ্যৎ কোথায় মিলালো
এ দিনের নিঃস্বতার তলে ? আমারে চাহেনা কেহ ;
কেঁদে গান ফিরে যায় ; নিষ্প্রভ যে আকাশের আলো।
মৃত্যুরে উত্তরি যায় গান, মান, আত্মজন, গৃহ ;
চাহি নাই সে অমৃত—জীবনেরে বেসেছি যে ভালো।

পুস্তক সমালোচনা

সানাই—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; বিশ্বভারতী ; মূল্য ১৷৷০

কবি মাত্রেরই মন সাধারণের অপেক্ষা বেশি সচেতন। সাধারণের অপেক্ষা শুধু তাঁহাদের প্রকাশ-শক্তিই যে বেশি তাহা নয়, তাঁহাদের সংবেদন-শক্তিও তীক্ষ্ণতর এবং গভীরতর। কঠিন রোগশয্যা হইতেও তাই রবীন্দ্রনাথ যখন চীনের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, বিপন্ন মানব-সভ্যতার জন্য বিচলিত হন, তখন এই কথাটিই আমাদের বেশি করিয়া মনে পড়ে যে, কবিও তাঁহার যুগের মানুষ। কিন্তু কথাটা হয়ত এই যুগের কবির সম্বন্ধে যত সত্য পূর্ব যুগের কবিদের সম্বন্ধে তত সত্য নয়। তাহার কারণও সুস্পষ্ট। তখনকার মানুষ ছিল দেশে-দেশে বিভক্ত, ভেদ-রেখা ছিল অলঙ্ঘ্য, কবিরা সেই পরিবেশের মধ্যে আবার নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে বিশিষ্টতর করিয়া তুলিতেন, বাস্তব জগতের ভিড় তাঁহাদের প্রাণে প্রবেশপথ পাইত না। তাঁহাদের গান চলিত রাজসভায়, মার্জিত জনের জন্য মার্জিত রুচিতে ও মার্জিত বাণীতে। তাই বলিয়া মানব-ধর্মের নিগূঢ় বাণী যে সে গানে ভাষা পাইত না, তাহা নয় ; মানব-স্বভাবের যে অংশ গভীরতম, সে অংশ তাঁহাদেরও সংবেদনশীল চিত্তে ছায়াপাত করিত। তাই, কবি কালিদাসের মত রোম্যান্টিক কবির কবিতায় এবং গ্যয়টের মত অতি-বিদগ্ধ মনস্বীর সৃষ্টিতে মানুষ আপন ইতিহাস, আপন ভাগ্যলিপি কখনও পাঠ করিতে পারে ; করিয়াও থাকে। কবিত্বের এই রোম্যান্টিক-ধারা শেষ হয় নাই ; কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষের জগৎ বিচিত্রতর ও বৃহত্তর হইয়া উঠিয়াছে—জড়বিজ্ঞান তাহার অভিজ্ঞতার জগৎ প্রসারিত করিয়া দিল, মনোবিজ্ঞান তাহার চেতনার স্তরকে খুঁড়িয়া ফেলিল আর যানবাহনের পথরেখা ধরিয়া তাহার জীবন-নেমি দূর-দূরান্তরের দিকে ছুটিয়া গেল। মানুষ আবিষ্কার করিল, মৈত্রী-বিরোধের বাস্তব বন্ধনে দেশ বিদেশের মানুষ জড়াইয়া পড়িতেছে। এই বিশ্ব-সচেতনতা এখনও অস্পষ্ট ; বরং তাহার বিবাদী সুর, স্বজাতি সচেতনতাই, এই মুহূর্তে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের যাহা স্বধর্ম্ম অথচ যাহা সে জানিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কবি-হৃদয়ে তাহারই বাঙ্ময় প্রকাশ, তাই কবির ধর্মে যুগের ধর্মই সুনিশ্চিত রূপ গ্রহণ করে—যাহা বাস্তবের মধ্যে খণ্ডিত তাহাই কবি-চিত্তে স্বপ্রমিত, মূর্ত্ত। তাই—

"কাঁঠালের ভূতি পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ,
রান্না ঘরের পাঁশ,"

এই সবকে স্বীকার করিয়াই কবি বলিতে পারেন,—

"এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম রোমান্টিক
আমি সেই পথের পথিক
যে পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণা বাতাসে,
পাখির ইসারা যায় যে পথের অলক্ষ্য আকাশে।
মৌমাছি যে পথ জানে—
মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।" (অনসূয়া,পৃঃ ৮০)

স্পষ্ট করিয়া কবিকে বলিতে হইল—"এই সত্য কিম্বা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা।"

তর্কটা মিথ্যা, কারণ কবির অনুভূতি লোকে যে বাস্তব সমুত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি-লোক সংকীর্ণ নয়। বর্তমান জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান বা সমাজসম্বন্ধের দ্বারা আবিষ্কৃত জীবন-সত্যকে তাহা দূরে সরাইয়া আপনাকে রক্ষা করিতে চায় না। তাঁহার 'বলাকা' ও 'মহুয়া'র এই যুগ-জীবনের বাণীরূপ তাই স্পষ্ট। বর্তমান সময়েও তাঁহার জাগ্রত চিত্ত এই যুগের বাস্তব বস্তু পুঞ্জকেও কাব্যলোকে ডাকিয়া আনিতে গিয়াছে; বিষয়বস্তুতে, ভাববস্তুতে এমন কি কাব্যরীতিতে নূতন শ্রেণীহীনত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টাও কবি করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কাব্যক্ষেত্রে বাস্তব কাব্যের পরীক্ষা বলা যাইতে পারে—'নব জাতকে'র অনেক কবিতায় ও 'সানাই'য়ের দুই একটি ক্ষেত্রে ('বাসা-বদল'; 'অপঘাত') পরিচয় সম্পূর্ণ। সে পরীক্ষার চিহ্ন সুস্পষ্ট। যে কারণেই হউক, কলা-কৃতিত্ব থাকিলেও কাব্য-কৃতিত্ব তেমন অবিসংবাদিত নয়। রবীন্দ্রনাথ নিবন্ধ বা ছোটগল্পেও উহাদের রূপ দান করিতে পারিতেন। একটি বিশেষ চিত্র, বা মুহূর্তের 'মুড্' ছোট গল্প, নিবন্ধ বা খণ্ড কবিতার প্রেরণা জোগাইতে পারে; কিন্তু তবু এই তিনের জাতি স্বতন্ত্র। তাই, তাঁহার অধুনাতন কোনো কবিতায় জন্মগত কবিতার লক্ষণ পাওয়া যায় নাই; মনে হয়, ছন্দ লইয়া, ভাষা লইয়া, ভাব লইয়া একটা কলা-কুশলতার পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিয়াছেন। এবং এই 'সানাই'তে পৌঁছিতে পৌঁছিতে মনে হয়, তিনি বুঝিয়াছেন যে, প্রথমত কবিতা বাস্তবের প্রতিলিপি নয়, কবিতা বাস্তবের অন্তর্লিপি; দ্বিতীয়ত তাঁহার নিজস্ব কবিধর্ম "জন্ম-রোম্যান্টিক"—পৃথিবীর বর্তমান হইতে এই রোম্যান্টিক পলায়নেচ্ছু নয়; বরং এই বর্তমান সম্বন্ধে অতিসচেতন বলিয়াই ইহার অতীত প্রেক্ষাপট ও নবায়মান ভবিষ্যতের পট দুইই তাঁহার নিকট জীবন্ত; এবং বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন সত্য সম্বন্ধেই

তাঁহার মন সংবেদনশীল। নিমন্ত্রণ বাড়ির হৈ হৈ, উচ্ছিষ্ট পাতার স্তূপ, ওদিকে ধানের কল, ধানের পচানির গন্ধ—

"সমস্ত এ ছন্দ ভাঙ্গা অসঙ্গতি মাঝে
সানাই লাগায় তার সারঙের তান।
কী নিবিড় ঐক্য মন্ত্র করিছে সে দান
কোন্ উদ্‌ভ্রান্তের কাছে,
বুঝিবার সময় কি আছে।" ('সানাই', পৃঃ ২৩)

একদিকে বর্তমানের এই সাময়িক রূপটি বুঝিয়া কবি "বিপ্লব"কে স্বাগত করিতেছেন:

"তবে তাই হোক
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল বিনতি,
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণতলে ক্রূর বালুকারে!" (বিপ্লব, পৃঃ ৯)

অন্যদিকে সেই ঐক্যমন্ত্র বিশ্বের মূল উৎসের দিকেই কবিদৃষ্টিকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছে—

"প্রথম যুগের সেই ধ্বনি
শিরায় শিরায় উঠে রণরণি',
মনে ভাবি এই সুর প্রত্যহের অবরোধ পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ-আরম্ভের অজানা পর্য্যায়।" ('সানাই' পৃঃ ২৫)

ইহাই 'সানাই'য়ের ঐক্যতান, "জন্ম-রোম্যান্টিক" কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য-সাধনার ঐক্যতান—'সৃষ্টির নির্ঝরি ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে'; পরিবর্তনের স্রোতে পৃথিবী ভাসিয়া চলিলেও সেই অপরিবর্তনের ঐক্যতান তাহার আদি অন্ত ছাইয়া ধ্বনিত হইতেছে এই কারণেই বাস্তবের আঘাত বার বার সেই জন্ম-রোম্যান্টিক কবির মনের নব যুগ আরম্ভের পর্য্যায় খুলিয়া দিয়াছে। এই রহস্যই 'বলাকা'র কবির কাব্যপ্রাণ; 'মহুয়া'; 'পুনশ্চে'র শেষে কবি 'সানাই'তেও ছন্দে কথায় 'বলাকা'র সেই রহস্যকেই পুনঃস্বীকার করিয়াছেন। হয়ত ইহা 'বাস্তব' নয়, ইহা মিষ্টিক; ইহা 'আধুনিক' নয়, কারণ ইহা ছন্দে ভাবে সুষমামণ্ডিত; কিন্তু ইহা কাব্য।

তথাপি 'সানাই' পড়িতে পড়িতে আর একটি সংশয় মনে জাগিয়া উঠে। রবীন্দ্রকাব্যের চিরপরিচিত সুরই তো সানাইতেও পাই, যদিও তাহাতেও নূতনত্ব আছে; কিন্তু এই রবীন্দ্রকাব্যধারায় ইহার এমন গুরুত্ব কি? রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বাপর সচেতন; 'সানাই'য়ের স্বীকারোক্তি সেদিকে তেমন প্রয়োজনীয় ছিল না। বরং 'সানাই'তে তাঁহার বক্তব্য তাঁহার কাব্যকেও এক একবার ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এত বড় কলা-নিপুণ কবিরও কবিতায় যখন কথার ভার কবিতার গুরুত্ব অপেক্ষা স্থলে স্থলে ভারী হইয়া উঠে, তখন বুঝিতে পারি কেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বা ব্রাউনিংয়ের শেষ বয়সের কবিতা এমন গুরুভার হইয়া পড়িয়াছিল। সেই তুলনায় 'সানাই'য়ের কবিতা অবশ্য অনেক স্বচ্ছ। আর, তাহার কয়েকটি কবিতা অন্তত রবীন্দ্রনাথেরও পক্ষে উল্লেখযোগ্য। কোনো কবির সব কবিতাই সমান সার্থক হইলে বোধ হয় পৃথিবীতে কবিতার শেষ দিনই ঘনাইয়া আসিবে, ইহাও মনে রাখা উচিত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার স্পষ্ট আত্মপরিচয় হিসাবে 'সানাই' উল্লেখযোগ্য।

গোপাল হালদার

শিলালিপি—মণীশ ঘটক প্রণীত—প্রকাশক—কবিতা-ভবন; ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ। দাম দুই টাকা।

জীবনের প্রতি বৎসরের গড় কষিয়া উনচল্লিশ সংখ্যায় কবি উপনীত হইয়াছেন কিনা বলিতে পারি না; তবে বাহাতর পৃষ্ঠায় কোনই ইঙ্গিত নাই আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। এই উনচল্লিশটি কবিতার মধ্যে গদ্য কবিতাও আছে। ছন্দে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে অধিকাংশই চতুর্দ্দশপদী এবং তাহাদের কাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট মুন্‌সীয়ানার পরিচয় আছে; তাহার আলোচনা যথাস্থানে করিব। কবিতাগুলি পড়িবার পর একটি বিশিষ্ট কবি-মনের পরিচয় মনে থাকিয়া যায়। অনুপ্রাসের মোহে কবির অসতর্ক আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও, অলঙ্কারের বাহুল্য সত্ত্বেও, ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতি সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও, আধুনিক কাব্যধর্ম্মী বৈশিষ্ট্যবিলাস সত্ত্বেও, সমসাময়িক কবিদের অনুরণন সত্ত্বেও এই উনচল্লিশটি কবিতার প্রকাশভঙ্গি আশ্রয় করিয়া যে কবিমন আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে ইংরাজী কাব্যে তাহার সমগোত্র বোধ হয় কবি বায়রণ। বায়রণের মতই মণীশ ঘটকের কবিমানস ক্ষুব্ধ, অশান্ত, অধীর, বিদ্রোহী। বায়রণের মতই মণীশ ঘটকের

সামাজিক বোধ; বায়রণের মতই তাঁহার মন সচেতন, বলিষ্ঠ। আবার বায়রণের ন্যায়ই তাঁহার কাব্যের ত্রুটী ও স্খলন দুর্দ্দার ও দুর্বিনীত যৌবনের অসহায় উচ্ছ্বাস-প্রবণতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলির বহিরঙ্গ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথম সাতটী পয়ারে রচিত। এগুলি ছাড়া কবি চতুর্দ্দশ চরণের বন্ধনের মধ্যে বহুবিধ ছন্দকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'ব্যর্থ' কবিতাটি কুড়ি মাত্রার; 'প্লাবনে' 'দুই বিঘা জমির' স্ট্যান্‌জায় রচিত। 'দেবী ত নহ' সতের মাত্রার; 'চৈত্র-বেলা' আধুনিক কবিদের অতিপ্রিয় দীর্ঘ পয়ারে রচিত। মাত্রার তারতম্য ছাড়াও গঠনপদ্ধতিতেও মণীশ ঘটক অনেক মুন্‌সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। ইংরেজী ছন্দ-প্রকরণের প্রতীক গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে তাঁহার সনেটগুলি aab ccb aad eed ff; aabb cdcd eeffgg; abab cdcd efef gg; aa bb cc dd ee ff gg এবং আরও বহুবিধরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ইহাদের কোনটিকেই সনেট বলিলে বোধ হয় ঠিক হইবে না; কারণ মণীশ ঘটকের গীতিবহুল মন সনেটের ঋজু কাঠিন্যকে ঠিক স্ববশে আনিতে পারিত না, এবং যে সংযম ও চিন্তার সমাবেশ ভিন্ন সনেটের গতি সম্ভব নয়, মণীশ ঘটকের সজীব ও অতীব প্রাণবান কবিচিত্তে এখনও হয় ত সে সংযমের প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। তবে এই পর্য্যায়ের অনেক কবিতাই অতীব সুখপাঠ্য; এবং 'শবরী,—প্রতীক্ষায়' কবিতাটি শেষ চরণযুগলের স্থানচ্যুতির জন্য বিশেষ স্মরণীয়। এলিজাবেথীয় যুগে যে সনেট সেক্‌স্‌পীয়ার তিনটি স্ট্যান্‌জার পর একটী চরণ-যুগল গাঁথিয়া উদ্ভাবিত করেন, তাহাতে সনেটের গাম্ভীর্য্য ও বাঁধুনী না থাকিলেও রিনেসেন্‌স মনের আকুতি ও বিক্ষোভ তাহাকে অপূর্ব্ব রূপ দিয়াছিল। এই কবিতাগুলির শেষে যে যুগলচরণের ধীর পদবিক্ষেপ শ্রুত হইত তাহাতে ছিল সে যুগের 'Wise Saw' এবং এপিগ্রামপ্রিয়তা, যাহার জন্য সেক্‌স্‌পীয়ারের সনেটে অতি তুচ্ছ ভাবও এই এপিগ্রামের শানে পালিস হইয়া ক্ষুরধার ছুরিকায় পরিণত হইত:—

For as the Sun is daily new and old
So is my love still telling what is told.

'তারা' কবিতাটির শেষ দুই চরণ এবং 'শবরী,—প্রতীক্ষা'র স্থানচ্যুত কাপ্‌লেট

যুগযুগান্ত কালের পরিক্রমা
চলে অনিবার অঙ্ক নিয়তি সমা।

উপভোগ্য হইয়াছে, কিন্তু এপিগ্রামের কাঠিন্য ইহাতে ঠিক ধরা দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

গদ্য কবিতাগুলির রূপ লইয়া আলোচনা করিতে শঙ্কিত হইতেছি, কারণ গদ্য কবিতার সংযমহীন ধ্বনিপ্রবাহে কাব্যের আত্মা বিপর্য্যস্ত হন এই আমাদের স্থির বিশ্বাস হইলেও, যদি গদ্যরীতিতে কাব্য সৃষ্টি হয় তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই অবান্তর প্রসঙ্গ না তুলিয়া একটি মন্তব্য করা বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিতেছি। 'শিলালিপি'র কয়েকটি গদ্যকবিতা, যেমন 'দুর্য্যোগ', 'অনূঢ়া', 'চিলেকোঠা' ভাল লাগা সত্ত্বেও আমার মনে হয় অ্যাংগ্লো স্যাক্সন কবিতার অনুপ্রাস-পরায়ণতায় প্রতিষ্ঠিত যে রীতির কবি অনুসরণ করিয়াছেন স্বর-মাত্রিক বাংলা ভাষার স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাহাতে ব্যাহত হইয়াছে। উইল্‌ফ্রেড ওয়েনের ছন্দকৌশল বিশ্লেষণ করিলেই কবি বুঝিতে পারিতেন কেন ওয়েন অ্যাংগ্লো স্যাক্সন কবিতার ধ্বনি-প্রবাহকে গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু মণীশ ঘটকের সংস্কৃত কাব্যানুরাগী নাগরিক মন অনুপ্রাসের যে মোহে অভিভূত গদ্য কবিতায় সেই অনুপ্রাস সময়ে সময়ে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে। অনুপ্রাসের কুহকে আত্মহারা হইয়া তিনি 'শুকতারার' দীর্ঘায়িত গতি ভঙ্গীর সহিত 'অমাবস্যার' কবির পঙ্‌ক্তিতে "বন্ধ যেমন অন্ধ রাত্রি নিরন্ধ্র কন্দরে"র অদ্ভুত সমাবেশ করিয়াছেন। 'মেঘমৌলী মৌনী হিমাদ্রির সমাধিসর্ব্বস্ব মগ্ন-মানসে' তাহারই অজস্র অত্যাচার আমাদের কাব্যবোধকে পীড়িত করে।

তথাপি উৎকট ভঙ্গীসর্ব্বস্ব ও পাতুর রক্তহীনতা-বিলাসী কাব্যের অতি প্লাবনের দিনে মণীশ ঘটকের 'শৌর্য্য সমুদ্ধত', বলিষ্ঠ ও পৌরুষবিক্ষুব্ধ মনের পরিচয় আমাদের বিশেষ আনন্দ দিয়াছে। 'শিলালিপি' নাম করণের পিছনে যে পুরুষোচিত দম্ভ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা ব্যর্থ হয় নাই। আদিরিপু প্লাবনের বাঁধ উন্মোচন করিয়া তাঁহার কাব্যে প্রবাহিত হইলেও সুগম্ভীর সমারোহে প্রেমের প্রবাহ তাঁহার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই প্রেমে সমস্ত সার্থক কবির সাধারণ অধিকার। সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিকে সম্ভোগ করিবার স্পর্দ্ধায় তাঁহার কবিচৈতন্য গর্ব্বিত এবং সেই গর্ব্বের সহজ পরিচয় তাঁহার উৎসাহবহুল আত্মসমর্পণে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। উৎসাহ-বহুলতায় ভীতির কারণও আছে এবং সেই জন্যই তাঁহার প্রকৃতি-বিলাসে এমন একটি ধর্ম্মের পরিচয় আমরা পাই যাহা তাঁহার সুস্থ ও দৃপ্ত কবিমনের বিরোধী। এই দুর্ব্বলতাকে তিনি যখনই প্রশ্রয় দিয়াছেন, তখনই 'মাদু মন্থর', 'মাটি মায়ের সহোদরা', 'ঘুমের যাদুর' ইত্যাদি বাক্যের অবৈধ সম্মোহনে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সমস্ত দেহ সমগ্র মন অবিচ্ছিন্ন চৈতন্য দিয়া জীবনকে আলিঙ্গন করিবার ফলে তাঁহার ভালো লাগার ক্ষেত্র সুপরিসর। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, বহু সমসাময়িক কবির প্রকাশভঙ্গী তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে এবং যাহা

কিছু ভাল লাগে তাহাই তাঁহার মনে গভীর ছাপ রাখিয়া যায় বলিয়া 'বাণবিদ্ধ বিহঙ্গের বৈমনস্যে' ও 'নক্ষত্র খচিত তারকার নৈমিত্তিক নিঃস্বনে' সুধীন্দ্রনাথ; 'বন্ধ যেমন অন্ধ রাত্রিতে' অচিন্ত্যকুমার; 'সংমোহ করো সংহার, করো জয়ে' বিষ্ণু দে; 'জাগে মহাকালে' সজনীকান্ত অতি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। এই উৎসাহই আবার তাঁহার সদাজাগ্রত সামাজিকবোধে কৌতুক ও ব্যঙ্গ মিশ্রিত একটি অপূর্ব্ব সুষমার সৃষ্টি করিয়াছে, যদিও তাহার প্রকাশ 'গ্র্যাণ্ড গান গায়'—ইত্যাদি মুদ্রাদোষে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এই মুদ্রাদোষের মুখোস সত্ত্বেও 'শিলালিপি'র বহু গদ্য কবিতায় যে কৌতূহলী নগরবাসীর সন্ধান আমরা পাইয়াছি তাহাকে ট্রামে বাসে বাজারে বৈঠকে গানের মজলিসে বা তাসের আড্ডায় যে কোন স্থানেই আমরা চিনিতে পারিতাম—সে আমাদের সুপরিচিত, আমাদেরই নিতান্ত আপনার জন।

'শিলালিপি'র কবিতাগুলির লিখন প্রস্তরে উৎকীর্ণ লিপির ন্যায় দৃঢ়তাব্যঞ্জক না হইলেও সেগুলির জন্ম প্রকৃত অভিজ্ঞতায়, পুস্তকলব্ধ মানসিক বিলাসে নয়। মণীশ ঘটক মাঝে মাঝে অতি আধুনিক কবিধর্ম্মের প্ররোচনায় "হলা পিয়সহি"র ন্যায় টি. এস. এলিয়ট-পন্থী মুখভঙ্গী করিয়াছেন বটে; 'পথের ধারে ঝিমধরা কুকুর'ও দেখিয়াছেন সম্ভবত এই প্ররোচনায়, এবং 'মরাচাঁদের চাঁদোয়ার তলায়' 'বুকের গহ্বরে মিশরী মমির পাহারায়'ও জাগিয়া থাকিয়াছেন; তবুও তাঁহার কাব্যধর্ম্মে অতিআধুনিকতার আড়ষ্ট ও অতি-সচেতন বাহাদুরী নাই, আছে কবির স্বভাব-সুলভ মোহ, সুন্দরের প্রতি গভীর আসক্তি। তাঁহার কবিতাবলী পাঠের পর যে কোনও কাব্যানুরক্ত পাঠকের মনে জাগিয়া থাকিবে সারি সারি শালের ছবি :—

দীর্ঘ ঋজু দেহ মেলি সারি সারি শাল
বিনিদ্র প্রহর যাপে আমরণ কাল।

বর্ষার দিনে বন্ধ জানালা হঠাৎ খুলিয়া গেলেই 'ভয়ত্রস্ত শিশুর মতো বাত্যা-তাড়িত আর্ত্ত বৃষ্টিবিন্দু'র কথা মনে পড়িবে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে রেল-গাড়ীতে বসিয়া দূর পাশের পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে পড়িবে :

পলায়মান পাহাড়ের সার আসন্ন অন্ধকারের আবির্ভাবে ভীত।

দুর্য্যোগের দিনে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই মনে পড়িবে :

বিদ্যুতের ছোরাখেলা আকাশের বুক চিরে চিরে।

মণীশ ঘটকের কবিধর্ম্ম সনাতনপন্থী, এবং শাশ্বত দৃষ্টি দিয়াই তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন, তাই 'দ্রৌপদী' কবিতায় তিনি কৃষ্ণার আঁখির যে কৃষ্ণতারাকে চোখের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা ভুলিতে হয়ত সময় লাগিবে :—

মীন সঙ্কেতে লক্ষ্য ভেদের পথে
অলক্ষ্যে মীনকেতন এল যে রথে
চকিতে নেহারি, চমকিল দিশাহারা
কৃষ্ণা তোমার আঁখির কৃষ্ণতারা।

উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন :—

তবু ভুল করে ভালোবাসি বার বার
ভালো লাগে সব, যারা ভালো লাগিবার
ভ্রান্তিবিলাস সনাতন মত্ততা।

এই 'সনাতন মত্ততা' তাঁহাকে যেন কোনও দিন ত্যাগ না করে। তত্তকথার কুহকে ভুলিয়া তিনি জীবনকে বিভ্রম বলিয়া পাশ কাটাইয়া গেলে তাঁহার পারমার্থিক কল্যাণ হয়ত হইতে পারে; কিন্তু স্বার্থপর আমরা,—তাঁহার কল্যাণ কামনা করি না।

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

একদা—গোপাল হালদার
ধাত্রী দেবতা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় } রঞ্জন পাবলিসিং হাউস হইতে প্রকাশিত

ব্লোকচক্ষুর অন্তরালে বাংলা দেশে রাষ্ট্র প্রচেষ্টার প্রথম পত্তন হইয়াছিল। স্বদেশী যুগে সমগ্র দেশে যখন প্রকাশ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তখনও এই প্রচেষ্টা অলক্ষ্যেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্ট সমগ্র ভারতে গোপন বিদ্রোহের আয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হইয়া উহা দমন করিতে চেষ্টা করেন। ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের প্রয়োগে ও রাউলাট রিপোর্টে দেশের লোক এই ব্যাপক আয়োজনের কথা অবগত হয়। তখনকার মত বিদ্রোহের আগুন প্রশমিত হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা যে একেবারে নিবিয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় পুনরায় চব্বিশ সালে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স আইন জারিতে। তাহার পর ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার কথা সকলেরই স্মরণ আছে। সাধারণের দৃষ্টির বাহিরে কিরূপে এই আন্দোলন এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল একদিন সে ইতিহাস রচিত হইবে; ঐতিহাসিক সন্ধানী দৃষ্টিতে তাহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধও নির্ণয় করিবে। কিন্তু সমাজের একটি বিশেষ ঘটনা হিসাবে সাময়িক সাহিত্যে ইহার আলোচনা দেখিতে এখনই আগ্রহ জন্মে। আমাদের স্বল্পপরিসর সমাজের বাঁধা-ধরা আবর্ত্তনের মাঝে এই আন্দোলনের বৈচিত্র্য বিশেষ স্মরণীয়তার দাবী করিতে পারে। আমাদের দেশের সকলে এই আন্দোলনের সহিত জড়িত হয় নাই, সেই জন্য ইহাকে জাতীয় আন্দোলন আখ্যা দিতে কেহ

কেহ আপত্তি করিতে পারেন। তথাপি এই আন্দোলনের লক্ষ্যের সহিত জাতির আকাঙ্খার ঐক্য ছিল বলিয়াই জাতীয় আন্দোলনের ইহা একটি বিশেষ অংশ ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই আন্দোলনের প্রথম যুগে দেশের লোক ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানিত না; ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছে এবং অনুভব করিয়াছে কত আশা ও ব্যর্থতা, বেদনা ও গৌরব ইহার সহিত জড়িত। তথাপি আন্দোলনকারীদের বুঝিতে কেহ চেষ্টা করে নাই। এই আন্দোলনের আদর্শরূপ ও তাহার বিকৃতি অতি দ্রুত পরম্পরায় দেখা দিল; অথচ আন্দোলনকারীদের স্বরূপ আগের মতই অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

আলোচ্য উপন্যাস দুইখানিতে এই আন্দোলনের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। 'ধাত্রী দেবতা'র বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে ইহা ১৯০৫-২১ সালের ঐতিহাসিক পটভূমির উপর রচিত উপন্যাস। 'একদা' তিরিশ সালের স্মরণীয় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর একটি দিনের কাহিনী। 'দিনে দিনে মিলাইলে তাহাই রূপ পরিগ্রহ করিয়া ইতিহাসের মধ্যে বাণীমূর্ত্তি লাভ করে।' অতএব 'একদা' কালের ইতিহাস প্রবাহের একতম কাহিনী। ইহার ভিত্তি তিরিশ সালের সন্ত্রাসবাদ ও অন্যান্য বিপ্লব-আয়োজন। তাহা ছাড়া সাময়িক সমাজের অঙ্গন পরিক্রমণ করিয়া সমাজের রূপ ও গতি বিশ্লেষণ করিবার ইহাতে চেষ্টা হইয়াছে এবং ভবিষ্য সমাজের রূপের ইঙ্গিত দিবার প্রয়াস ইহাতে আছে। সেই আগত দিনের প্রবেশ পথ নির্ম্মাণের উপায় ও আয়োজনের আভাষ দিতে লেখক চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের সহানুভূতি কোন দিকে তাহা গোপন রাখেন নাই বলিয়া উপন্যাসখানি অতিমাত্রায় 'পার্সন্যাল' মনে হয়। 'ধাত্রী দেবতা'র এই আন্দোলনের কাহিনী বিবৃত করাই উদ্দেশ্য নহে। পটভূমি হিসাবে যথার্থই ইহা পিছনে রহিয়াছে। শিবনাথ শৈশবে বীরভূমের উন্মুক্ত উষর প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ধাত্রী দেবতার সহিত যে যোগ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাই তাহাকে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে দেশবাসীর দারিদ্র্য দুর্দ্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের মুক্তি কামনায় তাহাকে সন্ত্রাসবাদীদের সহিত যুক্ত করিয়াছে এবং অসহযোগ আন্দোলনে ব্রতী হইতে প্রেরণা দিয়াছে। শিবনাথের জীবনের এই অংশটি আশ্রয় করিয়াই এই কাহিনী রচিত হইয়াছে। তারাশঙ্করের সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে ধারণা উপন্যাসগুলিতে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কিছুটা রঙিন। তাহা সত্ত্বেও পূর্ণ ও সুশীল জীবন্ত চরিত্র। তাহাদের পরার্থপরতা, কষ্ট ও বিপদকে হাসিমুখে তুচ্ছ করিবার ক্ষমতা তাহাদের আদর্শনিষ্ঠার পরিচায়ক। 'একদা'র মণীশ এবং সুনীল দুইজনেই বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হইয়াছে; অতি হীন প্রতিবেশের ভিতর অনায়াসে দিনের পর

দিন অতিবাহিত করিয়াছে। তাহাদের শক্তির উৎস কোথায়, কেন তাহাদের স্বাস্থ্যকর প্রতিবেশে স্নান হয় না, কোন আলোক তাহাদের প্রেরণা জোগায় 'একদা'য় সবই রহস্যময় কুহেলিকায় আবৃত। 'ধাত্রী দেবতা'র পূর্ণ ও 'একদা'র সুনীল দুইজনেই তাহাদের কর্মপথে বিভিন্ন কারণে প্রবল আঘাত পাইয়াছে। পূর্ণ যেখানে সাময়িক বিধাগ্রস্ত, সুনীল সেখানে বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে প্রায় 'সিনিক'। সিনিক কখনও আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারে না। সুনীলের মনের এই গতি তাহার আদর্শবাদীরূপকে চোখে পড়িতে দেয় না, মনে হয় সে morbid; পূর্ণর সতেজ আদর্শপ্রীতি মনকে নাড়া দেয়।

আজকাল প্রায়ই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় আধুনিক বাংলাদেশ সর্বদিক দিয়া নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছে। সত্যই তাহা হইয়াছে কি না উত্তরকালে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের সমাজে একটি লক্ষ্যহীন অস্থিরতা দেখা দিয়াছে। জাতীয় জীবনে কর্মের অপ্রাচুর্য সম্বন্ধে সকলে হয়ত সচেতন নহে, কিন্তু জীবিকার্জনের উপায়ের অভাব অত্যন্ত প্রকট। জীবিকার অভাবে সমাজে অনেক অংশে ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে; লক্ষ্য স্থির না থাকাতে সেই সঙ্গে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। অন্যান্য স্বাধীন দেশে কর্মের বিস্তৃত ক্ষেত্রে যুবশক্তি বিকাশের পথ পায়; কর্মই সেখানে আহার জোগাইতে সাহায্য করে। আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরূপ; কর্ম আমাদের দেশে নাই, কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিবার শক্তিও অন্তর্ভূত হইতেছে না। গোপাল হালদার তাঁহার উপন্যাসে. সমাজের এই দিকে আলোক সম্পাত করিয়াছেন। সোস্যালিজ্‌ম্‌এ বিশ্বাসী গোপাল হালদারের দৃষ্টিতে দেখিলে উপন্যাসে 'অমিত'-কথিত উপায় ছাড়া এই সমস্যার অন্য কোনও সমাধান কল্পনা করা যায় না। গোপালবাবু রাষ্ট্র ও সমাজের নানা দিক অবলম্বনে বহু চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রায়ই লিখিয়া থাকেন; ঐ সব প্রবন্ধে এবং বর্তমান উপন্যাসে তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় মিলিবে। তাঁহার আন্তরিকতা মনকে স্পর্শ না করিয়া পারে না। কিন্তু আলোচ্য বইখানির অন্তঃস্থিত যে সুর অস্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় তাঁহার চিন্তালব্ধ সমাধান আমাদিগকে প্রস্তুত হইয়া জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইতে সাহায্য করিবে না। ইহার জন্য তাঁহার রচনারীতিই দায়ী। তাঁহার উপন্যাসের নায়ক অমিত অলস নহে; কিন্তু তাহার জীবন যাত্রার যে ইতিহাস আমরা পাই তাহাতে কর্মপ্রেরণা আসে না। অমিত যদিও ব্রজেন বাবুকে বলিয়াছে 'It is an age of action—আপনি কর্মের মধ্যে দিয়েই এই যুগের নৈতিক আধ্যাত্মিকরূপের সন্ধান করুন'। কর্ম অর্থে অমিত—(এবং গোপালবাবুও) বোঝেন রাষ্ট্র-

প্রচেষ্টা। 'মানব সভ্যতার নবজন্মের আয়োজন—মানব সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা—সমাজের সেই নবজন্মের চেষ্টা কর্মের সেই আনন্দলোকে অমিত চায় নবজন্ম।' 'এই জেনারেশনের ভাগ্যলিপি কাজের মধ্যে পূর্ণ হওয়া।' এই ধরণের অনেক কথা আছে। কিন্তু অধিক রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন সে শয্যাশ্রয় করিল তখন এই প্রশ্নই মনে ওঠে যে এইরূপ বিকিপ্ততায় যাহার দিন কাটিতেছে চিন্তায় সত্যের সন্ধান পাইলেও কর্মে তাহা রূপ পরিগ্রহ করিবে কেমন করিয়া? চিন্তা ও কর্মের সময়য় কী করিয়া ঘটিবে?

গোপাল হালদার পাশ্চাত্য জ্ঞানলোকের সন্ধান রাখেন। এই উপন্যাস-খানিতেও তাহার বহু প্রমাণ আছে। উপন্যাস বর্ণিত ব্রজেন বাবু ও অমিত জ্ঞানী ব্যক্তি। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষার রূপ ও প্রেরণা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত এই জ্ঞান ব্রজেন বাবু স্পেন্সলার পড়িয়া আহরণ করিয়াছেন শুনিলে হাসি পায়। স্পেন্সলার না পড়িয়াও যদি ব্রজেন বাবুর উক্ত স্পৃহা জাগিত তাহা হইলে তাঁহাকে কেহ নিন্দা করিত না; গোপাল বাবুকে ত নহেই। উপন্যাস খানির আরও দুই এক স্থানে অনাবশ্যক বিদেশী লেখক ও পুস্তকের নাম উল্লেখ করিবার দুর্বলতা গোপাল বাবু প্রকাশ করিয়াছেন।

'একদা' গোপাল হালদার মহাশয়ের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাস হিসাবে 'একদা' সফল হয় নাই। উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনা সমর্থন করা যাইতে পারে, যদি ঘটনার সমবেশে এবং বিশ্লেষণের নিপুণতায় চরিত্রগুলি ফুটিয়া ওঠে। বর্ত্তমান উপন্যাসখানির চরিত্রগুলি হয় অস্পষ্ট, না হয় টাইপ। বিপ্লবীরা সকলে—মণীশ, সুনীল, যুগল, দীনু, মোতাহের, কমরেড দাস কেহই আপন টাইপের সীমা রেখার ভিতরে নিজস্ব বৈচিত্র্যে সমুজ্জল হইয়া উঠিতে পারে নাই। অন্যান্য চরিত্রগুলির আংশিক ঔজ্জ্বল্য আছে; কিন্তু তাহাদের অতি সামান্য পরিচয় আমরা পাই। স্ত্রী চরিত্রগুলির কাহারও কোনও বর্ণই নাই। ইন্দ্রাণী বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা ঢাকিতে আত্মবিলোপের আয়োজন করিয়াছে; কিন্তু তাহাকে প্রাণহীন মনে হয় বলিয়াই তাহার জীবনের ব্যর্থতা করুণার উদ্রেক করে না।

বর্ত্তমানযুগে রচনারীতিতে অবচেতন মনের অসংলগ্ন প্রকাশের যে ছজুক দেখা দিয়াছে, লেখক সে প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। তথাপি তাঁহার রচনা কষ্টপাঠ্য নহে, ভাষা সহজ ও অনাড়ম্বর।

'ধাত্রী দেবতা'কে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনের প্রথম যুগের কাহিনী হিসাবে দেখিলে ভুল হইবে। সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন এই উপন্যাসখানিতে যতটা স্থান পাইয়াছে একটু রোমাণ্টিক হইলেও এই আন্দোলনের রূপ তাহাতে কিছুটা উদ্ঘাটিত

হইয়াছে। তারাশঙ্কর গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার রচিত ছোটগল্পে অসংখ্য বিচিত্র নরনারীর পরিচয় আমরা পাইয়াছি। যদিও তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর আকৃতি বা প্রকৃতি ঠিক সুস্থ নয় তবু তাহারা বাস্তব এবং বিশেষ। চরিত্রাঙ্কনে তাঁহার ক্ষমতা আছে; আলোচ্য উপন্যাসখানিতে বহু চরিত্রের সমাবেশ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শিবনাথের পিসীমা। বনিয়াদী বংশের তেজ অহঙ্কার ও শিক্ষার সহিত অতৃপ্ত মাতৃস্নেহের কোমলতা মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মহিমাময়ী নারী তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। বাহিরের দৃঢ়তার অন্তরালে সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের মত ছোটখাট ব্যাপারে ঈর্ষ্যা ও ক্ষমতাপ্রিয়তার সাময়িক প্রকাশ তাহাকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে বিপ্লবী দাদা, পূর্ণ, বিপ্লবী চরিত্র হিসাবে সার্থক। সুশীলের নিঃসংশয় আদর্শপ্রীতি তৎকালীন বিপ্লবীদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ছোটখাট আরও অনেক চরিত্র আছে, তাহাদের বিস্তৃত সমালোচনা সম্ভব নহে।

শিবনাথের চরিত্র বইখানির ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রথম যৌবনের চিন্তা ও কর্ম্ম শৈশবের ছেলেখেলা অতিক্রম করিয়া পরিণত বয়সের ধীরতায় কেমন করিয়া পর্য্যবসিত হইল তাহার ক্রমোৎপত্তি দেখানো হয় নাই। অতি সামান্য কয়েক দিনের মধ্যে তাহার এই পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক মনে হয়।

এই উপন্যাসখানি ঘটনাবহুল। বাংলা দেশের চাষীর অভাব ও দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করুণ দৃশ্যগুলি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থেও তিনি এই প্রকার ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। এই সব বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে গ্রামের সমাজের রূপ সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করিবার সুযোগ পাইয়াও লেখক তাহা গ্রহণ করেন নাই। গ্রামের লোক ও সমাজ যেন ভয়ে ভয়েই প্রবলপ্রতাপ জমিদার বাড়ীর বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। শিবনাথ তাহার মায়ের নিকট হইতে দেশ ও দশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল, শিশুকালে মাঠে ও ঘাটে ঘুরিয়া দেশের উপর তাহার আকর্ষণ স্বভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু দশের সহিত তাহার পরিচয় কেমন করিয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল তাহা আমরা জানিতে পারি না। ওলাওঠা মহামারীতে গ্রামের পীড়িতদের মাঝে শিবনাথ প্রাণপণ সেবা করিতেছে দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা নিছক শিক্ষার গুণেই, অস্পষ্ট আদর্শের প্রেরণায় করিয়াছে। গ্রামের লোকের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়া তাহাদের সুখদুঃখ আকাঙ্খার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার কোনও চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায় না।

কয়েকটি চরিত্রের উপর লেখক একটু অবিচার করিয়াছেন। শিবনাথ যে সব লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে শ্বশুরবাড়ী সম্পর্কিত লোকেরা সকলেই তুলনায় অতি নিম্নস্তরের লোক হিসাবে চিত্রিত হইয়াছে। শৈশবের আদর্শানুরাগী কমলেশ শিবনাথের সহিত তাহার ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিল বলিয়াই যেন পরবর্ত্তী কালে সে সাধারণ বাঁধাধরা জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইল। তাহার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা যেন এক ভিন্ন দেশের লোক। শিবনাথের পরিবার ও তাহার শ্বশুরকুলের স্বভাবের পার্থক্য আছে। এই কারণে শিবনাথের স্ত্রী গৌরী ও শিবনাথের প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য বহুবার সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে; স্বভাবের নিয়মে তাহার পরস্পরের কাছে আসিয়াছে, আবার প্রবল সংঘর্ষে দুই জনেই আরও দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের প্রকৃতির অসামঞ্জস্যের এই দ্বন্দ্ব অতি নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। তথাপি তাহার শ্বশুরকুলের সকলেরই চিন্তা ও কর্ম্ম একই ছাঁচে ঢালা—ইহাতে মন সায় দেয় না। একই প্রতিবেশে বসবাস করার ফলে স্বভাব সম্পূর্ণ একই রকম হইবে জৈবনীতির এই নিয়ম মানুষের বেলায় খাটে না। নিম্নস্তরের জীবের মত মানুষ প্রতিবেশের দাস নহে।

শিবনাথের মাতার মৃত্যুর পর উপন্যাসখানির গতি অত্যন্ত শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিপ্লবী দাদাকে হত্যা করা প্রভৃতি ঘটনাতে গল্পের স্রোত যে প্রবল বেগে চলিয়াছিল তাহার গতিরক্ষা সম্ভব হয় নাই। দেশব্যাপী বিপ্লব আয়োজনের চেষ্টা সফল হইল না; শিবনাথের ব্যক্তিগত জীবন একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। শেষাংশের কাহিনীর ধীর গতি এই অসাফল্য ও ব্যর্থতার পরিচায়ক তাহা বলা যায় না। লেখকের ইহাই উদ্দেশ্য থাকিলে শেষাংশ আরও অনেক সংক্ষিপ্ত করা উচিত ছিল।

শেষদিকে কয়েকটি চরিত্রের পরিণতিও স্বাভাবিক হয় নাই। কাশীতে শিবনাথের পিসীমা বহির্জগতের পরিচয় পাইয়াছিলেন, সে পরিচয় কেমন করিয়া এত গভীর হইল যে তাঁহার আজন্মের শিক্ষা বংশানুক্রমিক সংস্কারকে একেবারে উল্টাইয়া দিল তাহা বুঝা যায় না। উপন্যাসখানির সমাপ্তি মধুর করিবার উদ্দেশ্যেই গৌরীকে মামা বাড়ীর শিক্ষা ও আবেষ্টনীর বাধা ডিঙাইয়া হঠাৎ শিবনাথের গৃহে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

তারাশঙ্করের বর্ণনাভঙ্গি সরস, একমাত্র সেই গুণেও বইখানি সমাদর পাইতে পারে। বইখানির পরিকল্পনা আধুনিক কালের সকল উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র। এই কারণে বইখানি উপরোক্ত ত্রুটিগুলি থাকা সত্ত্বেও ভাল লাগে।

শ্রীকরালীকান্ত বিশ্বাস.

সন্ধানে—শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী, শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম, পণ্ডিচেরী। দি কালচার পাবলিশার্স, ২৫ এ, বকুলবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ২৸০।

এই বইখানির পূর্ব্বে লেখিকার আরও দুইখানি বই প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে তিনি একেবারে নবাগতা নহেন। লেখিকা পণ্ডিচেরী আশ্রমবাসিনী এবং বইখানিও উৎসর্গ করিয়াছেন 'শ্রীঅরবিন্দ-চরণে,' কাজেই ইহা যে কেবলমাত্র গল্প বলিবার উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুত উপন্যাসের ধরণে লিখিত হইলেও বইখানি উপন্যাসের পর্য্যায়ে পড়ে না। ইহার রচনার মূলে লেখিকার বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে। সংসারের নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাতে ব্যর্থতা ও বেদনার মধ্যে ক্লিষ্ট মানবমন প্রায়ই যে পরিণতির জন্য ক্রমশ ব্যগ্র হইয়া উঠে লেখিকা তাহারই সন্ধান দিতে চাহিয়াছেন। লেখিকা আদর্শবাদিনী, পূর্ণতার প্রতি তাঁহার অন্তরের গভীর আকর্ষণ আছে, বইখানি পড়িলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়। "জগৎ জোড়া এ কী বিরাট রহস্য, এর মূলে কি কেউ নেই?" (পৃঃ ৬৪)—এ প্রশ্ন বারে বারে তাঁহার মনে জাগিয়াছে। এই জটিল ও দুরূহ প্রশ্নের কাছে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসে লেখিকা তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন।

উপন্যাস হিসাবে বিচার করিতে গেলে বইখানির বহু ত্রুটি নজরে পড়ে। প্রথমত দেখা যায়, অঙ্কিত চরিত্রগুলির একটিও স্বাভাবিক নহে এবং স্বাভাবিক পরিবেষ্টনের মাঝেও তাহারা বিকাশ লাভ করে নাই। অনুপম, রেণু, নির্ম্মল, সুপ্রিয়া সকলেই সমাজের বিশেষ একটি শ্রেণীর লোক, যে-শ্রেণীর সহিত সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক নাই। প্রতি দিনের জীবন যাত্রায় যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রগুলি তাহাদের কেহ নহে। তাহাদের জগৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এই জগতের সহিত শতকরা একজন শিক্ষিত বাঙালীও পরিচিত নহেন। তাই ভোগ ঐশ্বর্য্যের মাঝে বর্দ্ধিত হইয়া তাহারা যে দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিতে শিখিয়াছে তাহার মাঝে অবাস্তবতা ও ভাব-বিলাসিতা যথেষ্ট বিরাজমান।

অনুপমের চরিত্র আদর্শ চরিত্র হিসাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু লেখিকা শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। রেণুর চরিত্র বরং অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে। সুপ্রিয়ার চরিত্র যেমন দুর্ব্বল তেমনি অসঙ্গতিপূর্ণ। তাহার নিজস্ব সত্বা বলিতে কিছু নাই, আছে কেবল অন্ধ হৃদয়াবেগের নিকট একান্ত আত্মসমর্পন। সে-ও আদর্শ খুঁজিতেছে, কিন্তু তাহার সন্ধানের পিছনে অস্থিরতা আছে, শক্তি নাই। এজন্য তাহার আচরণে কোথাও কার্য্য কারণ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নির্ম্মলের চরিত্র খানিকটা স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। বিমলের চরিত্র চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তাহার আত্মহত্যার ব্যাপারটি অত্যধিক নাটকীয় হইয়াছে।

উপন্যাসখানি ঘটনাবহুল নহে, বরং যে কয়টি ঘটনা লইয়া ইহা লিখিত সেগুলি আরও অল্প জায়গার মধ্যে অনায়াসে লিপিবদ্ধ করা যাইত। মূল ঘটনাগুলির মধ্যেও বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই। তবে কতকগুলি দৃশ্য খুবই মনোহারী হইয়াছে। এ দৃশ্যগুলি সর্ব্ব প্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত ও অনবদ্য।

ইউরোপ এবং ইউরোপীয় সমাজ সম্বন্ধে লেখিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, 'বিলেত দেশটা মাটির' নামক বইখানিতেও তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। বৈদেশিক আবহাওয়ার মাঝে চরিত্রগুলিকে একেবারে বেমানান লাগে না। স্বদেশের সহিত তাহাদের কোন যোগ নাই; ইহাতে নূতনত্ব থাকিলেও লেখিকার দর্শনভঙ্গি ও চিন্তা ধারায় ইহাই বড় একটি ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ইংলণ্ডে ইউরোপীয় ছাত্রদের সহায়তায় ভারতীয় ছাত্রদল কর্ত্তৃক অনুসৃত রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশটি মনে রেখাপাত করে না। মনে হয় নিছক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার জন্যই এই আন্দোলনের ছবি আঁকা হইয়াছে। গভীর রাত্রে স্তিমিত আলোয় দেয়ালের শ্রবণেন্দ্রিয় আছে ধরিয়া লইয়া অতি সঙ্গোপনে রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার যে দৃশ্যটি দেখান হইয়াছে তাহা হাস্যকর। এরূপ অতি রোমাণ্টিক ও অতি নাটকীয় দৃশ্য বর্ত্তমান যুগে অচল।

বইখানি চলতি ভাষায় রচিত, কিন্তু বেশীর ভাগ চলতি ভাষার রচনার মত ইহা আড়ষ্ট বা ভারাক্রান্ত নহে। লেখিকার সাবলীল ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করিবার বিষয়। যথেষ্ট ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বইখানি উল্লেখযোগ্য। লেখিকার গভীর আন্তরিকতা প্রত্যেক পাঠকই অনুভব করিবেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৯৩৯)। পত্র সংখ্যা ১৷৵+৫৪১ মূল্য তিন ৩৲ (তিন টাকা)।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে স্যর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের বিখ্যাত উইলসন্ ফিললজিক্যাল লেকচারে ভারতবর্ষে নূতন ইউরোপীয় পদ্ধতিতে প্রথমে ভারতীয়

ভাষাসমূহের আলোচনা আরম্ভ। তৎপর যে কয়েকজন মনীষী তাঁহার আরব্ধ কার্য্য যোগ্যতার সহিত গ্রহণ করেন ও এই বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য শ্রম-স্বীকার করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। ভাষাতাত্ত্বিকরূপে সুনীতিবাবুর খ্যাতি শুধু স্বদেশেই নিবদ্ধ নহে; বিদেশেও (ইউরোপে) তিনি প্রচুর সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। সুনীতিবাবুর আলোচনার মুখ্য বিষয় ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব। বঙ্গদেশে স্বেচ্ছাচার-মূলক আক্রমণ হইতে বঙ্গভাষাকে বাঁচাইবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজীবিদ্যায় একদল পণ্ডিত কতকটা সচেতনভাবে আর কতকটা অক্ষমতার জন্য অজ্ঞাতেই বঙ্গভাষাকে নির্ম্মমভাবে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর এক সম্প্রদায়ের লেখক অযথা বাঙ্গালাভাষায় প্রয়োজনাতি-রিক্ত উর্দ্দু ও ফারসী শব্দাদি প্রবেশ করাইয়া ইহাকে বিকৃত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। "ইঙ্গস্কৃত" ও "উর্দ্দিস্কৃত" এই দুই প্রকার অস্বাভাবিক রীতিই যে বঙ্গভাষার কেবল শত্রু তাহা নহে, অপর পক্ষে পুরাতনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রেণীর মধ্যে একদল সংস্কৃত ভাষার আইন কানুন বাঙ্গালাভাষার উপর চালাইতে চেষ্টিত। তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরিব সহিষ্ণু বাঙ্গালীর ভাষার উপর এই যে যুগপৎ ত্রিশক্তির আক্রমণ ইহার প্রতিরোধ কল্পে যাঁহারা বদ্ধপরিকর সুনীতিবাবু তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইউরোপে যেমন Steinthal, Hermann Osthoff, Meillet, Jespersen, Wright প্রভৃতি junggramatikar বা তরুণবৈয়াকরণগণ ক্লাসিক্যাল ভাষার আলোচনার আধারের উপর দেশীয় কথ্য ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া মানুষের ভাষা ও মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের সন্ধান আবিষ্কার করিতে চেষ্টিত হইলেন, ইঁহাদের নিকট যেমন কথ্য ভাষা দেশের আপামর জনসাধারণের ভাষা বলিয়া অনাদরণীয় পরিগণিত হয় নাই, তেমনি ভাণ্ডারকর, সুনীতিবাবু প্রভৃতি ভারতীয় "junggrammatikar" গণও এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইলেন। সুনীতিবাবুর বর্ত্তমান ব্যাকরণখানি খাঁটী বাঙ্গালা ভাষার একান্ত নির্ভরযোগ্য ব্যাকরণ হিসাবে অতুলনীয় বলা যাইতে পারে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "Origin and Development of the Bengali Language"এ তিনি ভারতীয় ভাষাসমূহ তথা বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিক তুলনামূলক গবেষণা করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক আলোচনা থাকিলেও প্রধানতঃ গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার বর্ণণাত্মক ব্যাকরণ

বা Descriptive Grammar; প্রধানত বাঙ্গালাভাষার নিজস্ব ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব বাক্যরীতি ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তত্ত্ব নির্দ্দেশ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ পোর্ত্তুগীস্ পাদ্রি মানোএল্ দা আসুম্পসাম কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। তারপর রাজা রামমোহন রায় এবং আরও অনেকেই বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতরূপের সমগ্র পরিচয় ইঁহাদের কাহারও গ্রন্থে সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। খাঁটী বাঙ্গালার ব্যাকরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। এই গ্রন্থে বাঙ্গালার স্বকীয় ভঙ্গী সম্পর্কে অনেকটা নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অতি স্বাভাবিক কারণে পণ্ডিত মহাশয়ের আলোচনা পদ্ধতি বহুস্থলেই অসংলগ্ন হওয়ায় ব্যাকরণখানি সম্পূর্ণাঙ্গ হয় নাই। বিশেষতঃ বাঙ্গালার উচ্চারণতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ কোন তথ্যই এই গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। তথাপি বহুস্থলেই পণ্ডিত মহাশয়ের সূক্ষ্মদৃষ্টির আলোকে বাঙ্গালার নিজস্ব রূপটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সুনীতিবাবু বর্ত্তমান গ্রন্থে ভাষাবিজ্ঞানের নীতি সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়া তথ্যবিশ্লেষণ করায় ভাষার প্রকৃত পরিচয় আমাদের নিকট অক্ষুণ্ণ অখণ্ড মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙ্গালা স্বরবর্ণের উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বাদি বাগ্‌যন্ত্রের সমাবেশ এবং বাঙ্গালা স্বরধ্বনির শ্রেণী বিভাগ বিষয়ক যে বাগ্‌যন্ত্রের চিত্র সুনীতিবাবু অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে এই অতিশয় জটিল বিষয়টি অত্যন্ত সরল হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত অন্যান্য ভাষার উপাদান সম্পর্কে আলোচনাও অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছে।

অন্য কোনও বাঙ্গালা ব্যাকরণে বাঙ্গালা শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন (Semantics) লইয়া আলোচনা দেখি নাই, যদিও এই বিভাগটি ব্যাকরণের অপরিহার্য্য অঙ্গ। গতিশীল মানব জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খার পরিচয় বহন করে যে ভাষা, সে ভাষার শব্দে প্রকাশমানতাও কখনও কমে কখনও বাড়ে, আবার কখনও বা সম্পূর্ণরূপে বিপরীত মুখে ধাবিত হয়। সুনীতিবাবুর ব্যাকরণে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষার অর্থ পরিবর্ত্তনের আলোচনা পাইলাম। বাঙ্গালা বাক্যরীতি সম্পর্কেও এই গ্রন্থেই প্রথম আলোচনা দেখিলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক "Morphology" শব্দের অনুবাদে ব্যবহৃত "রূপতত্ত্ব" শব্দটি অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। রূপতত্ত্বের আলোচনাও তথ্য ও তত্ত্বে সুষমামণ্ডিত।

যদিও প্রধানত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, তবু প্রসঙ্গত ভাষার সংজ্ঞা, ব্যাকরণ বিভাগ, ভাষালিখন, প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় এই

গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ভাষালিখন প্রসঙ্গে লিপির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে অনেকেই জ্ঞান লাভ করিবেন।

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ যদিও সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ নহে, তথাপি বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে যে সংস্কৃত ভাষার অপরিসীম প্রভাব বিদ্যমান ছিল এই সত্যটির যথাযোগ্য বিচার সুনীতিবাবু করিয়াছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই বাঙ্গালা রীতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় প্রচলিত ও স্বীকৃত সংস্কৃত ভাষার উপকরণ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা সুনীতিবাবুর ব্যাকরণের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থের উপসংহারে একটি দীর্ঘ পরিশিষ্টে (৪৪৩-৫৪১) বাঙ্গালা ছন্দ, অলঙ্কার, সংস্কৃত ধাতু ও তাহা হইতে জাত বাঙ্গালা তৎসম শব্দ, সংস্কৃত, ইংরেজী, হিন্দুস্থানী, ফারসী, আরবী ব্যাকরণের সহিত বাঙ্গালা ব্যাকরণের তুলনা, প্রভৃতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ শিক্ষিত সাধারণের পক্ষে অতিশয় উপযোগী কয়েকটি মূল্যবান বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

ছন্দ প্রসঙ্গে ভক্টর চট্টোপাধ্যায় যে সমস্ত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলির কোন কোনটির সম্পর্কে কাহারও কাহারও কিঞ্চিৎ মতভেদ থাকিতে পারে।

কিন্তু ছন্দ ভাষাপ্রকাশ ব্যাকরণের মূল বক্তব্যের অপরিহার্য্য অংশ নহে। পূর্ব্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে নিঃসংশয়িতচিত্তে স্বীকার্য্য যে আলোচ্য গ্রন্থখানি এবম্প্রকার আলোচনার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্কুলের ছাত্রের পক্ষে হয়ত শিক্ষকের প্রচুর সহায়তা ব্যতীত ইহাতে প্রবেশ সহজ হইবে না। তবে বাঙ্গালী কলেজের ছাত্র এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজকে এই মহামূল্যবান গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। মূল্যও খুব বেশী ধার্য্য হইয়াছে বলা যায় না।

শ্রীশম্ভুচন্দ্র চৌধুরী

ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ। শ্রীকমলা দেবী, এম, এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই পুস্তকে যে সংক্ষিপ্ত জীবনী দুইটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, উহাদের উৎপত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রচনা প্রতিযোগিতা হইতে হইয়াছে। নিবন্ধ দুইটির জন্য লেখিকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বর্ণপদক পাইয়াছেন। প্রতিযোগিতা সম্ভবত ছাত্রীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তবু বৃহত্তর সাহিত্য ক্ষেত্রেও উহারা স্থান পাইবে। ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় জীবনী ও ব্যক্তিগত নিবন্ধের যে ঐশ্বর্য্য

আছে তাহার তুলনায় বাংলা ভাষায় কিছুই নাই বলা উচিত। বাংলায় যে কয়খানা ভাল (বা উল্লেখ করিবার মত) জীবনী আছে উহাদের সবগুলিই বিগত যুগে লিখিত, আর ব্যক্তিগত নিবন্ধের একান্ত অভাব যে বাংলা সাহিত্যের একটা গুরুতর অভাব তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেন এই ব্যাপারটা ঘটিয়াছে উহার কারণ বাহির করিতে হইলে সাহিত্যের বাহিরে যাইতে হয়। জীবনী সংক্ষিপ্তই হউক আর পূর্ণাবয়বই হউক উহা শুধু সাহিত্যিক আর্টই নয়; উহা একদিকে ইতিহাস ও অন্য দিকে সমাজ বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সামাজিক বিবর্ত্তন কোন ধারায় চলিয়াছে তাহার সম্বন্ধে যাহাদের মন সজাগ নয় তাহারা সামাজিক বিবর্ত্তনের হেতু বা অবলম্বন ব্যক্তি সম্বন্ধেও সচেতন হইতে পারে না। দ্বিতীয় কথা মানব চরিত্র সম্বন্ধে এই কৌতূহল এবং চরিত্রবৈশিষ্ট্য ধরিবার ক্ষমতা না থাকিলে জীবনী লেখা যায় না। তৃতীয়ত, অতীত সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও আগ্রহ এবং অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন সূত্র রহিয়াছে তাহার উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন। এই সকল বিষয়েই বাঙালী মন অল্পবিস্তর অসাড়। নহিলে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবন সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোন পুস্তকই নাই কেন? যে 'পলিটিক্স' সম্বন্ধে আমরা এত উগ্রভাবে সজাগ সেই 'পলিটিক্সে'র ভিত্তি বাংলার স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে কোন বইই বাংলায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেন? অবশ্য কি ব্যক্তি, কি ঐতিহাসিক ধারা লইয়া গবেষণা যে না হইতেছে তাহা নয়। কিন্তু এখনও উহা নিতান্তই গবেষণার পর্য্যায়ে আবদ্ধ আছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছায় নাই। কয়েকটি কথায় ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক ব্যাপারের স্বরূপ ধরাইয়া দেওয়া, উহাদের জীবন্ত করিয়া তোলা, উহাদের বিশিষ্ট 'রস' পাঠকের মনে সঞ্চার করান, এখনও বাঙালী সাহিত্যিকের ভাবী ও অপূর্ণ কৃত্যের তালিকায় রহিয়াছে, বাংলা সাহিত্যের পুঁজির অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

বর্ত্তমান রচনা দুইটি উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে উহাদের মধ্যে দুইটি আধুনিক বাঙালীকে বুঝিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাদের একজন আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের সত্যকার স্রষ্টা, আর একজন তেমনই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের সত্যকার স্রষ্টা। অথচ ইহাদের সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় কোন আলোচনাই প্রায় বর্ত্তমানে যে হয় না, উহা আমাদের 'কালচার'-সংক্রান্ত নাবালকত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বঙ্কিম ও সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কেহ বা অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে পারেন; কেহ বা এত উচ্চ ধারণা না করিয়া সমালোচনা করিতে পারেন। কিন্তু উহাদের ভুলিয়া থাকিতে পারে বা উঁহারা যে এ যুগের বাঙালী জীবনের ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিতে পারে সে-ই যাহার মন

উপস্থিত মুহূর্ত্তের চাপ অতিক্রম করিয়া মানব-জীবনের অগ্র ও পশ্চাৎ সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে না। এই ভাবে 'চিরন্তন বর্ত্তমানে' বাস করা আদিম মানব ও জন্তুর লক্ষণ, সভ্য মানুষের ধারা নয়।

নিবন্ধ দুইটীতে বঙ্কিম ও সুরেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য যে সর্ব্বাংশে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহা লেখিকার ত্রুটি নয়। বোধ করি স্যাঁত বোভ-ই এক জায়গায় বলিয়াছিলেন, পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সের আগে কেহ ভাল সাহিত্য সমালোচক হইতে পারে না। কারণ কবিতা বা উপন্যাস সহজাত প্রতিভা দ্বারা রচনা করা যায়, কিন্তু সাহিত্য সমালোচনা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ; এই অভিজ্ঞতা একদিনে সংগ্রহ করা যায় না। জীবনী সম্বন্ধে এই কথা আরও প্রযোজ্য। লোক-চরিত্রের যে অভিজ্ঞতা হইতে মানুষ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি জন্মে তাহা সময়সাপেক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথকে ভাল করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে শুধু যে বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত ইতিহাসে ব্যুৎপত্তি থাকা প্রয়োজন তাহাই নয় রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত কার্য্যকলাপের সহিত বিছু পরিমাণ সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকিলে আরও ভাল। লেখিকা সবে মাত্র ছাত্রী অবস্থা অতিক্রম করিয়া গবেষণাক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একেবারে নূতন কথা বা সূক্ষ্ম আলোচনা আশা করা অন্যায় হইবে। ইহাই যথেষ্ট যে তিনি এই দুইটি পুরুষ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাহা কিছু তথ্য আছে সংক্ষেপে তাহার সবটুকুই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইঁহাদের সম্বন্ধে আলোচ্য প্রশ্ন যেগুলি আছে তাহারও অবতারণা করিয়াছেন। এইটুকু করিতেও বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে কেহ অগ্রসর হয় নাই। লেখকজীবনের প্রারম্ভেই লেখিকা যে অনুসন্ধিৎসা ও ঐতিহাসিক কৌতূহল দেখাইয়াছেন, তাহার পরিণতি দেখিবার আশা আমরা রাখি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কারের জন্য রচিত প্রবন্ধ মূল্যবান ও মৌলিক ঐতিহাসিক গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে, ব্রাইসের 'হোলী রোমান এম্পায়ার' তাহার একটী উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। লেখিকার ঐতিহাসিক গবেষণা সুষ্ঠুভাবে আরব্ধ হইয়াছে, পরিণত হওয়াও উচিত। তিনি যে বিষয় বাছিয়া লইয়াছেন, উহাতে কাজ অতি অল্পই হইয়াছে। সুতরাং তিনি কৃতিত্ব দেখাইবার যথেষ্ট অবকাশ পাইবেন।

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন কর্ত্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা, হইতে মুদ্রিত এবং শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল কর্ত্তৃক ৬বি, বকুল বাগান রো, ভবানীপুর, হইতে প্রকাশিত।

দি বেঙ্গল পোল্‌ট্রি ডেয়রী
এণ্ড
এগ্রিকাল্‌চার লিমিটেড
গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টার্স
স্থাপিত—১৯৩০
হেড অফিস—২৫, সোয়ালো লেন
ফার্ম্ম এবং বাগান—ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড
ম্যানেজিং এজেণ্টস্—লাহিড়ী করঞ্জাই এণ্ড কোং
চীফ অরগ্যানাইজার—মিঃ ডি. এল. দাস
এজেন্সির জন্য সত্বর আবেদন করুন

THE NEW YEAR BOOK 1941
Edited by J. GUHA THAKURTA, M. A., (Cal.),
M.Sc. (Econ.), (Lond.), in Applied Statistics (Commercial)
In its pages are crammed a mass of information on a variety of topics and subjects of considerable interest to people of all ages and all walks of life.
Dr. H. Sinha, M.Sc., Ph.D. in the Foreword says:—". . . . . To me the most interesting part lies in the many and varied statistical tables. These have not been hastily compiled from the most readily available sources, such as the *Statistical Abstract for British India*. In every case, the original source has been utilised, making the figures as up-to-date as possible . . . . . .
". . . . Among other highly proficient contributors, who have enriched the pages of this Year Book are Mr. Nirad C. Chaudhuri and Mr. Pankaj Gupta. Mr. Chaudhuri's article on World War and Mr. Gupta's compilation of the Sports Section are sure to win approbation from every reader.
"I have no hesitation in recommending this Year Book to all who desire to have accurate and incisive information regarding economic, social and political condition of India."
Pp. 300. Price Re. 1/-
S. C. SARKAR & SONS Ltd.
1/1/1C, College Square, Calcutta. Phone : B. B. 818